শান্তিনিকেতন

(অষ্টম)

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম

বোলপুর

মূল্য ।০ আনা

প্রকাশক—
শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস্
২২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কান্তিক প্রেস
২০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা
শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

সূচী

শান্তিনিকেতন

ওঁ

ওঁ শব্দের অর্থ, হাঁ। আছে এবং পাওয়া গেল এই কথাটাকে স্বীকার। কাল আমরা ছান্দোগ্য উপনিষৎ আলোচনা করতে করতে ওঁ শব্দের এই তাৎপর্য্যের আভাস পেয়েছি।

যেখানে আমাদের আত্মা "হাঁ"কে পায় সেইখানেই সে বলে ওঁ।

দেবতারা এই হাঁকে যখন খুঁজ্‌তে বেরিয়েছিলেন তখন তাঁরা কোথায় খুঁজে শেষে কোথায় পেলেন? প্রথমে তাঁরা ইন্দ্রিয়ের দ্বারে দ্বারে আঘাত করলেন। বল্লেন চোখে দেখার মধ্যে এই হাঁকে পাওয়া যাবে। কিন্তু দেখ্‌লেন চোখে দেখার মধ্যে সম্পূর্ণতা

নেই—তা হাঁ এবং নায়ে খণ্ডিত। তার মধ্যে পরিপূর্ণ বিশুদ্ধতা নেই—তা ভালও দেখে মন্দও দেখে, খানিকটা দেখে খানিকটা দেখেনা ; সে দেখে কিন্তু শোনেনা।

এমনি করে কান নাক বাক্য মন সর্ব্বত্রই সন্ধান করে দেখ্‌লেন সর্ব্বত্রই খণ্ডতা আছে সর্ব্বত্রই দ্বন্দ্ব আছে।

অবশেষে প্রাণের প্রাণে গিয়ে যখন পৌছলেন তখন এই শরীরের মধ্যে একটা হাঁ পেলেন। কারণ এই প্রাণই শরীরের সব প্রাণকে অধিকার করে আছে। এই প্রাণের মধ্যেই সকল ইন্দ্রিয়ের সকল শক্তির ঐক্য। এই মহাপ্রাণ যতক্ষণ আছে ততক্ষণই চোখও দেখ্‌চে কানও শুন্‌চে নাসিকাও ঘ্রাণ করচে। এর মধ্যে যে কেবল একটা "হাঁ" এবং অন্যটা "না" হয়ে আছে তা নয় এর মধ্যে দৃষ্টি শ্রুতি আঘ্রাণ সকলগুলিই এক জায়গায় হাঁ হয়ে আছে—অতএব শরীরের মধ্যে এইখানেই

আমরা পেলুম ওঁ। বাস্, অঞ্জলি ভরে উঠ্‌ল।

ছান্দোগ্য বল্‌চেন মিথুনের মাঝখানে অর্থাৎ দুই যেখানে মিলেছে সেইখানেই এই ওঁ। যেখানে একদিকে ঋক্ একদিকে সাম, একদিকে বাক্য একদিকে সুর, একদিকে সত্য একদিকে প্রাণ ঐক্য লাভ করেছে সেইখানেই এই পরিপূর্ণতার সঙ্গীত ওঁ।

যাঁর মধ্যে কিছুই বাদ পড়েনি—যাঁর মধ্যে সমস্ত খণ্ডই অখণ্ড হয়েছে, সমস্ত বিরোধ মিলিত হয়েছে আমাদের আত্মা তাঁকেই অঞ্জলি জোড় করে হাঁ বলে স্বীকার করে নিতে চায়। তার পূর্ব্বে সে নিজের পরম পরিতৃপ্তি স্বীকার করতে পারেনা; তাকে ঠেক্‌তে হয়, তাকে ঠক্‌তে হয়, মনে করে ইন্দ্রিয়েই হাঁ, ধনেই হাঁ, মানেই হাঁ—শেষকালে দেখে, এর সব তা'তেই পাপ আছে, দ্বন্দ্ব আছে, "না" তার সঙ্গে মিশিয়ে আছে।

সকল দ্বন্দ্বের সমাধানের মধ্যে উপনিষৎ সেই পরম পরিপূর্ণকে দেখেছেন বলেই সত্যের একদিকেই সমস্ত ঝোঁকটা দিয়ে তার অন্য দিকটাকে একেবারে নির্ম্মূল করে দিতে চেষ্টা করেননি। সেইজন্যে তিনি যেমন বলেছেন

"এতজ্‌ জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্মসংস্থং
নাতঃপরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ"

অর্থাৎ, আত্মাতেই যিনি নিত্য স্থিতি করচেন তিনিই জানবার যোগ্য, তাঁর পর জানবার যোগ্য আর কিছুই নেই ;—তেমনি আবার বলেছেন,—

"তে সর্ব্বগং সর্ব্বতঃ প্রাপ্য ধীরা
যুক্তাত্মানঃ সর্ব্বমেবাবিশন্তি।"

অর্থাৎ সেই ধীরেরা যুক্তাত্মা হয়ে সর্ব্বব্যাপীকে সকল দিক হতেই লাভ করে সর্ব্বত্রই প্রবেশ করেন।

"আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি" নয়, কেবল আত্মার মধ্যেই আত্মাকে দেখা নয়—সেই দেখাই আবার সর্ব্বত্রেই।

আমাদের ধ্যানের মন্ত্রে এক সীমায় রয়েছে ভূর্ভুবস্বঃ অন্য সীমায় রয়েছে আমাদের ধী আমাদের চেতনা—মাঝখানে এই দুইকেই একে বেঁধে সেই বরণীয় দেবতা আছেন যিনি একদিকে ভূর্ভুবঃস্বঃকেও সৃষ্টি করচেন আর-এক দিকে আমাদের ধীশক্তিকেও প্রেরণ করচেন। কোনোটাকেই বাদ দিয়ে তিনি নেই—এই জন্যই তিনি ওঁ।

এই জন্যেই উপনিষৎ বলেছেন যারা অবিদ্যাকেই সংসারকেই একমাত্র করে জানে তারা অন্ধকারে পড়ে আবার যারা বিদ্যাকে ব্রহ্মজ্ঞানকে ঐকান্তিক করে বিচ্ছিন্ন করে জানে তারা গভীরতর অন্ধকারে পড়ে। একদিকে বিদ্যা আর একদিকে অবিদ্যা, এক দিকে ব্রহ্মজ্ঞান এবং আর একদিকে সংসার এই দুইয়ের যেখানে সমাধান হয়েছে সেই-খানেই আমাদের আত্মার স্থিতি।

দূরের দ্বারা নিকট বর্জ্জিত, নিকটের দ্বারা

দূর বর্জ্জিত, চলার দ্বারা থামা বর্জ্জিত থামার দ্বারা চলা বর্জ্জিত, অন্তরের দ্বারা বাহির বর্জ্জিত বাহিরের দ্বারা অন্তর বর্জ্জিত—কিন্তু

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে
তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ

তিনি চলেন অথচ চলেন না, তিনি দূরে অথচ নিকটে, তিনি সকলের অন্তরে অথচ তিনি সকলের বাহিরেও—অর্থাৎ চলা না-চলা, দূর নিকট, ভিতর বাহির সমস্তর মাঝখানে সমস্তকে নিয়ে তিনি—কাউকে ছেড়ে তিনি নন—এইজন্য তিনি ওঁ।

তিনি প্রকাশ ও অপ্রকাশের মাঝখানে। একদিকে সমস্তই তিনি প্রকাশ করচেন আর-একদিকে কেউ তাঁকে প্রকাশ করে উঠ্‌তে পারচে না—তাই উপনিষদ বলেন—

ন তত্র সূর্য্যোভাতি ন চন্দ্রতারকা
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।

সেখানে সূর্য্য আলো দেয় না, চন্দ্র তারাও না, এই বিদ্যুৎ সকলও দীপ্তি দেয় না, কোথায় বা আছে এই অগ্নি—তিনি প্রকাশিত তাই সমস্ত প্রকাশমান, তাঁর আভাতেই সমস্ত বিভাত।

তিনি শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্। শান্তম্ বল্‌তে এ বোঝায় না সেখানে গতির সংস্রব নেই। সকল বিরুদ্ধ গতিই সেখানে শান্তিতে ঐক্যলাভ করেছে। কেন্দ্রাতিগ এবং কেন্দ্রানুগ গতি, আকর্ষণের গতি এবং বিকর্ষণের গতি পরস্পরকে কাট্‌তে চায় কিন্তু এই দুই বিরুদ্ধ গতিই তাঁর মধ্যে অবিরুদ্ধ বলেই তিনি শান্তম্। আমার স্বার্থ তোমার স্বার্থকে মান্‌তে চায় না, তোমার স্বার্থ আমার স্বার্থকে মান্‌তে চায় না—কিন্তু মাঝখানে যেখানে মঙ্গল সেখানে তোমার স্বার্থই আমার স্বার্থ এবং আমার স্বার্থই তোমার স্বার্থ—তিনি শিব তাঁর মধ্যে সকলেরই স্বার্থ মঙ্গলে নিহিত রয়েছে। তিনি অদ্বিতীয় তিনি এক।

তার মানে এ নয় যে, তবে এ সমস্ত কিছুই নেই—তার মানে, এই সমস্তই তাঁতে এক। আমি বলচি, আমি তুমি নয়, তুমি বল্‌চ তুমি আমি নয়, এমন বিরুদ্ধ আমাকে-তোমাকে এক করে রয়েছেন সেই অদ্বৈতম্‌।

মিথুন যেখানে মিলেছে সেইখানেই হচ্চেন তিনি—কেউ যেখানে বর্জ্জিত হয়নি সেইখানেই তিনি। এই যে পরিপূর্ণতা যা সমস্তকে নিয়ে—অথচ যা কোনো খণ্ডকে আশ্রয় করে নয়—যা চন্দ্রে নয় সূর্য্যে নয় মানুষে নয় অথচ সমস্ত চন্দ্র সূর্য্য মানুষে—যা কানে নয় চোখে নয় বাক্যে নয় মনে নয় অথচ সমস্ত কানে চোখে বাক্যে মনে—সেই একেকেই, সেই হাঁকেই, সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে সেই পরিপূর্ণতাকেই স্বীকার হচ্চে ওঙ্কার।

১৫ই চৈত্র।

স্বভাবলাভ

মানুষের এক দিন ছিল, যখন, সে যেখানে কিছু অদ্ভুত দেখ্‌ত সেইখানেই ঈশ্বরের কল্পনা কর্‌ত। যদি দেখ্‌লে কোথাও জলের থেকে আগুন উঠ্‌চে অমনি সেখানে পূজার আয়োজন করত। তখন সে কোনো একটা অসামান্য লক্ষণ দেখে বা কল্পনা করে বল্‌ত, অমুক মানুষে দেবতা ভর করেছেন, অমুক গাছে দেবতার আবির্ভাব হয়েছে, অমুক মূর্ত্তিতে দেবতা জাগ্রত হয়ে আছেন।

ক্রমে অখণ্ড বিশ্বনিয়মকে চরাচরে যখন সর্ব্বত্র এক বলে' দেখবার শিক্ষা মানুষের হল তখন সে জান্‌তে পারল, যে যাকে অসামান্য বলে মনে হয়েছিল সেও সামান্য নিয়ম হতে ভ্রষ্ট নয়। তখনই ব্রহ্মের আবির্ভাবকে অখণ্ডভাবে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত করে দেখবার অধি-

কার সে লাভ করল। এবং সেই বিরাট অবিচ্ছিন্ন ঐক্যের ধারণায় সে আনন্দ ও আশ্রয় পেল। তখনি মানুষের জ্ঞান প্রেম কর্ম্ম মোহমুক্ত হয়ে প্রশস্ত এবং প্রসন্ন হয়ে উঠ্‌ল। তার ধর্ম্ম থেকে সমাজ থেকে রাজ্য থেকে মূঢ়তা ক্ষুদ্রতা দূর হতে লাগল।

এই দেখা হচ্ছে ব্রহ্মকে সর্ব্বত্র দেখা, স্বভাবে দেখা।

কিন্তু সমস্ত স্বভাব থেকে চুরি করে এনে তাঁকে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কোনো একটা কৃত্রিমতার মধ্যে বিশেষ করে দেখবার চেষ্টা এখনো মানুষের মধ্যে দেখ্‌তে পাওয়া যায়। এমন কি কেউ কেউ স্পর্দ্ধা করে বলেন সেই রকম করে দেখাই হচ্ছে প্রকৃষ্ট দেখা। সব রূপ হতে ছাড়িয়ে একটি কোনো বিশেষরূপে—সব মানুষ হতে সরিয়ে একটি কোনো বিশেষ মানুষে ঈশ্বরকে পূজা করাই তাঁরা বলেন পূজার চরম।

জানি, মানুষ এরকম কৃত্রিম উপায়ে কোনো একটা হৃদয়বৃত্তিকে অতি পরিমাণে বিক্ষুব্ধ করে তুল্‌তে পারে—কোনো একটা রসকে অত্যন্ত তীব্র করে দাঁড় করাতে পারে। কিন্তু সেইটে করাই কি সাধনার লক্ষ্য ?

অনেক সময় দেখা যায় অন্ধ হলে স্পর্শ-শক্তি অতিরিক্ত বেড়ে যায়। কিন্তু সেই রকম একদিকের চুরির দ্বারা অন্যদিককে উপ্‌চিয়ে তোলাকেই কি বলে শক্তির সার্থকতা ? যেদিকটা নষ্ট হল সেদিকটার হিসাব কি দেখ্‌তে হবে না ? সেদিকের দণ্ড হতে কি আমরা নিষ্কৃতি পাব ?

কোনোপ্রকার বাহ্য ও সঙ্কীর্ণ উপায়ের দ্বারা সম্মোহনকে মেস্‌মেরিজিম্‌কে ধর্ম্ম সাধনার প্রধান অঙ্গ করে তুল্‌লে আমাদের চিত্ত স্বাস্থ্য থেকে স্বভাব থেকে সুতরাং মঙ্গল থেকে বিচ্যুত হবেই হবে। আমরা ওজন হারাব—আমরা যেদিকটাতে এইরকম অসঙ্গত

ঝোঁক দেব সেইদিকটাকেই বিপর্য্যস্ত করে দেব।

বস্তুত স্বভাবের পরিপূর্ণতাকে লাভ করাই ধর্ম্ম ও ধর্ম্মনীতির শ্রেষ্ঠ লাভ। মানুষ নানা কারণে তার স্বভাবের ওজন রাখ্‌তে পারে না, সে সামঞ্জস্য হারিয়ে ফেলে—এই ত তার পাপের মূল এবং ধর্ম্মনীতি ত এইজন্যই তাকে সংযমে প্রবৃত্ত করে।

এই সংযমের কাজটা কি? প্রবৃত্তিকে উন্মূল করা নয় প্রবৃত্তিকে নিয়মিত করা। কোনো একটা প্রবৃত্তি যখন বিশেষরূপ প্রশ্রয় পেয়ে স্বভাবের সামঞ্জস্যকে পীড়িত করে তখনই পাপের উৎপত্তি হয়। অর্জ্জনস্পৃহা যখন অত্যন্ত উগ্র হয়ে উঠে টাকা অর্জ্জনের দিকেই মানুষের শক্তিকে একান্ত বাঁধতে চায় তখনই সেটা লোভ হয়ে দাঁড়ায়—তখনই সে মানুষের চিত্তকে তার সমস্ত স্বাভাবিক দিক থেকে চুরি করে এই দিকেই জড়ো করে।

এই প্রকারে স্বভাব থেকে যে ব্যক্তি ভ্রষ্ট হয় সে কখনোই যথার্থ মঙ্গলকে পায় না সুতরাং ঈশ্বরকে লাভ তার পক্ষে অসাধ্য। কোনো মানুষের প্রতি অনুরাগ যখন স্বভাব থেকে আমাদের বিচ্যুত করে তখনই তা কাম হয়ে উঠে। সেই কাম আমাদের ঈশ্বর-লাভের বাধা।

এই জন্য সামঞ্জস্য থেকে বিকৃতি থেকে মানুষের চিত্তকে স্বভাবে উদ্ধার করাই হচ্চে ধর্ম্মনীতির একান্ত চেষ্টা।

উপনিষদে ঈশ্বরকে সর্ব্বব্যাপী বলবার সময় যখন তাঁকে অপাপবিদ্ধ বলা হয়েছে তখন তার তাৎপর্য্য এই। তিনি স্বভাবে অবাধে পরিব্যাপ্ত। পাপ তাঁকে কোনো একটা বিশেষ সঙ্কীর্ণতায় আকৃষ্ট আবদ্ধ করে অন্যত্র থেকে পরিহরণ করে নেয় না—এই গুণেই তিনি সর্ব্বব্যাপী। আমাদের মধ্যে পাপ সমগ্রের ক্ষতি করে' কোন একটাকেই স্ফীত

করতে থাকে। তাতে করে কেবল যে নিজের স্বভাবের মধ্যে নিজের সামঞ্জস্য থাকে না তা নয়—চারিদিকের সঙ্গে সমাজের সঙ্গে আমাদের সামঞ্জস্য নষ্ট হয়ে যায়।

ধর্ম্মনীতিতে আমরা এই যে স্বভাবলাভের সাধনায় প্রবৃত্ত আছি—সমাজ এবং নীতিশাস্ত্র এজন্যে দিনরাত তাড়না করচে। এইখানেই কি এর শেষ? ঈশ্বর সাধনাতেও কি এই নিয়মের স্থান নেই? সেখানেও কি আমরা কোনো একটি ভাবকে কোনো একটি রসকে সঙ্কীর্ণ অবলম্বনের দ্বারা অতিমাত্র আন্দোলিত করে তোলাকেই মানুষের একটি চরম লাভ বলে গণ্য করব?

দুর্ব্বলের মনে একটা উত্তেজনা জাগিয়ে তার হৃদয়কে প্রলুব্ধ করবার জন্যে এই সকল উপায়ের প্রয়োজন এমন কথা অনেকে বলেন।

যে লোক মদ খেয়ে আনন্দ পায় তার

সম্বন্ধে কি আমরা ঐরূপ তর্ক করতে পারি ? আমরা কি বল্‌তে পারি মদেই যখন ও বিশেষ আনন্দ পায় তখন ঐটেই ওর পক্ষে শ্রেয় ?

আমরা বরং এই কথাই বলি যে যাতে স্বাভাবিক সুখেই মাতালের অনুরাগ জন্মে সেই চেষ্টাই উচিত। যাতে বই পড়তে ভাল লাগে, যাতে লোকজনের সঙ্গে সহজে মিশে ওর সুখ হয়, যাতে প্রাত্যহিক কাজকর্ম্মে ওর মন সহজে নিবিষ্ট হয় সেই পথই অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। যাতে একমাত্র মদের সঙ্কীর্ণ উত্তেজনায় ওর চিত্ত আসক্ত না থেকে জীবনের বৃহৎ স্বভাবক্ষেত্রে সহজভাবে ব্যাপ্ত হয় সেইটে করাই মঙ্গল।

ভগবানের ধারণাকে একটা সঙ্কীর্ণতার মধ্যে বেঁধে ভক্তির উত্তেজনাকে উগ্র নেশার মত করে তোলাই যে মনুষ্যত্বের সার্থকতা এ কথা বলা চলে না। ভগবানকেও তাঁর স্বভাবে পাবার সাধনা করতে হবে তাহলেই

সেটা সত্য সাধনা হবে—তাঁকে আমাদের নিজের কোনো বিকৃতির উপযোগী করে নিয়ে তাঁকে নিয়ে মাতামাতি করাকেই আমরা মঙ্গল বল্‌তে পারব না। তার মধ্যে একটা কোথাও সত্য চুরি আছে। তার মধ্যে এমন একটা অসামঞ্জস্য আছে যে, যে ক্ষেত্রে তার আবির্ভাব সেখানে মোহকে আর ঠেকিয়ে রাখা যায় না;—যিনি শক্ত লোক তিনি মদ সহ্য করতে পারেন তাঁর পক্ষে একরকম চলে যায় কিন্তু তাঁর দলে এসে যারা জমে তাদের আর কিছুই ঠিক ঠিকানা থাকে না; তাদের আলাপ ক্রমেই প্রলাপ হয়ে ওঠে এবং উত্তেজনা উন্মাদনার পথে অপঘাত মৃত্যুলাভ করে।

১৬ই চৈত্র।

অখণ্ড পাওয়া

ব্রহ্মকে পেতে হবে। কিন্তু পাওয়া কাকে বলে ?

সংসারে আমরা অশন বসন জিনিস পত্র প্রতিদিন কত কি পেয়ে এসেছি। পেতে হবে বল্‌লে মনে হয় তবে তেম্‌নি করেই পেতে হবে। তেমনি করে না পেলে মনে করি তবে ত পাচ্ছিনে। তখন ব্যস্ত হয়ে ভগবানকে পাওয়াও যাতে আমাদের অন্যান্য পাওয়ার সামিল হয় সেই চেষ্টা করতে চাই। অর্থাৎ আমাদের আসবাবপত্রের যে ফর্দ্দটা আছে, যাতে ধরা আছে আমার ঘোড়া আছে গাড়ি আছে আমার ঘটি আছে বাটি আছে তার মধ্যে ওটাও ধরে দিতে হবে আমার একটি ভগবান আছে।

কিন্তু ভাল করে ভেবে দেখার দরকার

এই যে ঈশ্বরকে পাবার জন্যে আমাদের আত্মার যে একটি গভীর আকাঙ্ক্ষা আছে সেই আকাঙ্ক্ষার প্রকৃতি কি ? সে কি অন্যান্য জিনিষের সঙ্গে আরো একটা বড় জিনিষকে যোগ করবার আকাঙ্ক্ষা ?

তা কখনই নয়। কেন না যোগ করে করে জড়ো করে আমরা যে গেলুম। তেমনি করে সামগ্রী গুলোকে নিয়তই জোড়া দেবার নিরন্তর কষ্ট থেকে বাঁচাবার জন্যেই কি আমরা ঈশ্বরকে চাই নে ? তাঁকেও কি আবার একটা তৃতীয় সামগ্রী করে আমাদের বিষয় সম্পত্তির সঙ্গে জোড়া দিয়ে বস্‌ব ? আরো জঞ্জাল বাড়াব ?

কিন্তু আমাদের আত্মা যে ব্রহ্মকে চায় তার মানেই হচ্ছে, সে বহুর দ্বারা পীড়িত এই জন্য সে এককে চায়, সে চঞ্চলের দ্বারা বিক্ষিপ্ত এই জন্য সে ধ্রুবকে চায়—নূতন কিছুকে বিশেষ কিছুকে চায় না—যিনি নিত্যোঽনিত্যানাং

সমস্ত অনিত্যের মধ্যে নিত্য হয়েই আছেন, সেই নিত্যকে উপলব্ধি করতে চায়—যিনি রসানাং রসতমঃ সমস্ত রসের মধ্যেই যিনি রসতম তাঁকেই চায় আর একটা কোনো নূতন রসকে চায় না।

সেই জন্যে আমাদের প্রতি এই সাধনার উপদেশ যে, ঈশাবাস্য মিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ—জগতে যা কিছু আছে তারই সমস্তকে ঈশ্বরের দ্বারাই আবৃত করে দেখ্‌বে—আর-একটা কোনো অতিরিক্ত দেখবার জিনিষ সন্ধান বা নির্ম্মাণ করবেনা—এই হলেই আত্মা আশ্রয় পাবে আনন্দ পাবে।

এমনি করেত নিখিলের মধ্যে তাঁকে জান্‌বে—আর ভোগ করবে কি? না, তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা—তিনি যা দান করচেন তাই ভোগ করবে—মাগৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং—আর কারও ধনে লোভ করবে না।

এর মানে হচ্ছে এই যে, যেমন জগতে

যা কিছু আছে তার সমস্তই তিনি পরিপূর্ণ করে আছেন এইটেই উপলব্ধি করতে হবে তেমনি তুমি যা কিছু পেয়েছ সমস্তই তিনি দিয়েছেন বলে জান্‌তে হবে। তা হলেই কি হবে? না, তুমি যা কিছু পেয়েছ তার মধ্যেই তোমার পাওয়া তৃপ্ত হবে। আরো কিছু যোগ করে দাও এটা আমাদের প্রার্থনার বিষয় নয়—কারণ সে রকম দিয়ে দেওয়ার শেষ কোথায়? কিন্তু আমি যা-কিছু পেয়েছি সমস্তই তিনি দিয়েছেন এইটেই যেন উপলব্ধি করতে পারি! তাহলেই অল্পই হবে বহু, তাহলেই সীমার মধ্যে অসীমকে পাব। নইলে সীমাকেই ক্রমাগত জুড়ে জুড়ে বড় করে কখনই অসীমকে পাওয়া যায় না—এবং কোটির পরে কোটিকে উপাসনা করেও সেই একের উপাসনায় গিয়ে পৌঁছন যেতে পারে না। জগতের সমস্ত খণ্ড প্রকাশ সার্থকতা লাভ করেছে তাঁর অখণ্ড প্রকাশে এবং

আমাদের অসংখ্য ভোগের বস্তু সার্থকতা লাভ করেছে তাঁরই দানে—এইটেই ঠিকমত জান্‌তে পারলে ঈশ্বরকে পাবার জন্যে কোনো বিশেষ স্থানের কোনো বিশেষ রূপের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াতে হয় না—এবং ভোগের তৃপ্তিহীন স্পৃহা মেটাবার জন্যে কোনো বিশেষ ভোগের সামগ্রীর জন্যে বিশেষ ভাবে লোলুপ হয়ে উঠ্‌তে হয় না।

১৭ই চৈত্র

আত্মসমর্পণ

তাই বলছিলুম, ব্রহ্মকে ঠিক পাওয়ার কথাটা বলা চলে না। কেন না তিনি ত আপনাকে দিয়েই বসে আছেন—তাঁর ত কোনোখানে কমতি নেই—এ কথা ত বলা চলে না যে, এই জায়গায় তাঁর অভাব আছে অতএব আর একজায়গায় তাঁকে খুঁজে বেড়াতে হবে।

অতএব ব্রহ্মকে পেতে হবে এ কথাটা বলা ঠিক চলে না—আপনাকে দিতে হবে বলতে হবে। ঐখানেই অভাব আছে—সেই জন্যেই মিলন হচ্চে না। তিনি আপনাকে দিয়েছেন আমরা আপনাকে দিইনি। আমরা নানা প্রকার স্বার্থের অহঙ্কারের ক্ষুদ্রতার বেড়া দিয়ে নিজেকে অত্যন্ত স্বতন্ত্র এমন কি বিরুদ্ধ করে রেখেছি।

এই জন্যই বুদ্ধদেব এই স্বাতন্ত্র্যের অতি কঠিন বেষ্টন নানা চেষ্টায় ক্রমে ক্রমে ক্ষয় করে ফেলবার উপদেশ করেছেন। এর চেয়ে বড় সত্তা বড় আনন্দ যদি কিছুই না থাকে তাহলে এই ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য নিরন্তর অভ্যাসে নষ্ট করে ফেলবার কোনো মানে নেই। কারণ, কিছুই যদি না থাকে তাহলে ত আমাদের এই অহং এই ব্যক্তিগত বিশেষত্বই একেবারে পরম লাভ—তাহলে এ'কে আঁকড়ে না রেখে এত করে নষ্ট করব কেন ?

কিন্তু আসল-কথা এই যে, যিনি পরিপূর্ণ-রূপে নিজেকে দান করেছেন আমরাও তাঁর কাছে পরিপূর্ণরূপে নিজেকে দান না করলে তাঁকে প্রতিগ্রহ করাই হবে না। আমাদের দিকেই বাকি আছে।

তাঁর উপাসনা তাঁকে লাভ করবার উপাসনা নয়—আপনাকে দান করবার উপাসনা। দিনে দিনে ভক্তি দ্বারা ক্ষমা

দ্বারা সন্তোষের দ্বারা সেবার দ্বারা তাঁর মধ্যে নিজেকে মঙ্গলে ও প্রেমে বাধাহীনরূপে ব্যাপ্ত করে দেওয়াই তাঁর উপাসনা।

অতএব আমরা যেন না বলি যে তাঁকে পাচ্চিনে কেন, আমরা যেন বল্‌তে পারি তাঁকে দিচ্চিনে কেন? আমাদের প্রতিদিনের আক্ষেপ হচ্চে এই যে

"আমার যা আছে আমি, সকল দিতে
পারিনি তোমারে নাথ!
আমার লাজ ভয়, আমার মান অপমান
সুখ দুখ ভাবনা।"

দাও, দাও, দাও, সমস্ত ক্ষয় কর, সমস্ত খরচ করে ফেল, তাহলেই পাওয়াতে একেবারে পূর্ণ হয়ে উঠ্‌বে।

"মাঝে রয়েছে আবরণ কত শত কত মত,
তাই কেঁদে ফিরি, তাই তোমারে না পাই
মনে থেকে যায় তাই হে মনের বেদনা।"

আমাদের যত দুঃখ যত বেদনা সে কেবল

আপনাকে ঘোচাতে পারছিনে বলেই—সেইটে ঘুচ্‌লেই যে তৎক্ষণাৎ দেখ্‌তে পাব আমার সকল পাওয়াকে চিরকালই পেয়ে বসে আছি।

উপনিষৎ বলেছেন, ব্রহ্ম তল্লক্ষ্য মুচ্যতে—ব্রহ্মকেই লক্ষ্য বলা হয়—এই লক্ষ্যটি কিসের জন্যে? কিছুকে আহরণ করে নিজের দিকে টানবার জন্যে নয়—নিজেকে একেবারে হারাবার জন্যে। শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ। শর যেমন লক্ষ্যের মধ্যে সম্পূর্ণ প্রবেশ করে তন্ময় হয়ে যায় তেমনি করে তাঁর মধ্যে একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে যেতে হবে।

এই তন্ময় হয়ে যাওয়াটা কেবল যে একটা ধ্যানের ব্যাপার আমি তা মনে করিনে। এটা হচ্চে সমস্ত জীবনেরই ব্যাপার। সকল অবস্থায়, সকল চিন্তায়, সকল কাজে এই উপলব্ধি যেন মনের এক জায়গায় থাকে যে, আমি তাঁর মধ্যেই আছি; কোথাও বিচ্ছেদ নেই। এই জ্ঞানটি যেন মনের মধ্যে

প্রতিদিনই ক্রমে ক্রমে একান্ত সহজ হয়ে আসে যে "কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ"—আমার শরীর মনের তুচ্ছতম চেষ্টাটিও থাকৃত না যদি আকাশপরিপূর্ণ আনন্দ না থাকৃতেন, তাঁরই আনন্দ, শক্তিরূপে ছোট বড় সমস্ত ক্রিয়াকেই চেষ্টা দান করচে। আমি আছি তাঁরই মধ্যে, আমি করচি তাঁরই শক্তিতে এবং আমি ভোগ করচি তাঁরই দানে এই জ্ঞানটিকে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের মত সহজ করে তুল্‌তে হবে এই আমাদের সাধনার লক্ষ্য। এই হলেই জগতে আমাদের থাকা, করা এবং ভোগ, আমাদের সত্য মঙ্গল এবং সুখ সমস্তই সহজ হয়ে যাবে—কেন না যিনি স্বয়ম্ভু, যাঁর জ্ঞান শক্তি ও কর্ম্ম স্বাভাবিক তাঁর সঙ্গে আমাদের যোগকে আমরা চেতনার মধ্যে প্রাপ্ত হব। এইটি পাওয়ার জন্যেই আমাদের সকল চাওয়া।

১৮ই চৈত্র।

সমগ্র এক

পরমাত্মার মধ্যে আত্মাকে এইরূপ যোগযুক্ত করে উপলব্ধি করা এ কি কেবল জ্ঞানের দ্বারা হবে? তা কখনই না। এতে প্রেমেরও প্রয়োজন।

কেন না আমাদের জ্ঞান যেমন সমস্ত খণ্ডতার মধ্যে সেই এক পরম সত্যকে চাচ্চে তেমনি আমাদের প্রেমও সমস্ত ক্ষুদ্র রসের ভিতরে সেই সকল রসের রসতমকে সেই পরমানন্দস্বরূপকে চাচ্চে—নইলে তার তৃপ্তি নেই।

জীবাত্মা যা কিছু নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে পেয়েছে তাই সে পরমাত্মার মধ্যে অসীমরূপে উপলব্ধি করতে চায়।

নিজের মধ্যে আমরা কি কি দেখচি।

প্রথমে দেখ্‌চি আমি আছি—আমি সত্য।

তার পরে দেখ্‌চি যেটুকু এখনি আছি এই টুকুতেই আমি শেষ নই। যা আমি হব, যা এখনো হইনি তাও আমার মধ্যে আছে। তাকে ধরতে পারিনে ছুঁতে পারিনে কিন্তু তা একটি রহস্যময় পদার্থরূপে আমার মধ্যে রয়েছে।

এ'কে আমি বলি শক্তি। আমার দেহের শক্তি যে কেবল বর্ত্তমানেই দেহকে প্রকাশ করে কৃতার্থ হয়ে বসে আছে তা নয়—সেই শক্তি দশ বৎসরের পরেও আমার এই দেহকে পুষ্ট করবে বর্দ্ধিত করবে। যে পরিণাম এখন উপস্থিত নেই সেই পরিণামের দিকে শক্তি আমাকে বহন করবে।

আমাদের মানসিক শক্তিরও এইরূপ প্রকৃতি। আমাদের চিন্তাশক্তি যে কেবলমাত্র আমাদের চিন্তিত বিষয়গুলির মধ্যেই সম্পূর্ণ পর্য্যাপ্ত তা নয়—যা চিন্তা করিনি ভবিষ্যতে করব তার সম্বন্ধেও সে আছে—যা চিন্তা

করতে পারতুম, প্রয়োজন উপস্থিত হলে যা চিন্তা করতুম তার সম্বন্ধেও সে আছে।

অতএব দেখা যাচ্চে যা প্রত্যক্ষ সত্যরূপে বর্ত্তমান—তার মধ্যে আর একটি পদার্থ বিদ্যমান যা তাকে অতিক্রম করে অনাদি অতীত হতে অনন্ত ভবিষ্যতের দিকে ব্যাপ্ত।

এই যে শক্তি, যা আমাদের সত্যকে নিশ্চল জড়ত্বের মধ্যে নিঃশেষ করে রাখেনি, যা তাকে ছাড়িয়ে গিয়ে তাকে অনন্তের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্চে এ যে কেবলমাত্র গতিরূপে অহরহ আপনাকে অনাগতের অভিমুখে প্রকাশ করে চলেছে তা নয় এর আর একটি ভাব দেখ্চি। এ একের সঙ্গে আরকে, ব্যষ্টির সঙ্গে সমষ্টিকে যোজনা করচে।

যেমন আমাদের দেহের শক্তি। এ যে কেবল আমাদের আজকের এই দেহকে কালকের দেহের মধ্যে পরিণত করচে তা নয়,

এ আমাদের দেহটিকে নিরন্তর একটি সমগ্রদেহ করে বেঁধে রাখ্‌চে। এ এমন করে কাজ করচে যাতে আমাদের শরীরের "আজ"ই একান্ত হয়ে না দাঁড়ায়, শরীরের "কাল"ও আপনার দাবী রক্ষা করতে পারে—তেমনি আমাদের শরীরের একাংশই একান্ত হয়ে না ওঠে, শরীরের অন্যাংশের সঙ্গে তার এমন সম্বন্ধ থাকে যাতে পরস্পর পরস্পরের সহায় হয়। পায়ের জন্যে হাত মাথা পেট সকলেই খাটচে আবার হাত মাথা পেটের জন্যেও পা খেটে মরচে। এই শক্তি হাতের স্বার্থকে পায়ের স্বার্থ করে রেখেছে পায়ের স্বার্থকে হাতের স্বার্থ করে রেখেছে।

এইটিই হচ্চে শরীরের পক্ষে মঙ্গল। তার প্রত্যেক প্রত্যঙ্গ সমস্ত অঙ্গকে রক্ষা করচে, সমগ্র অঙ্গ প্রত্যেক প্রত্যঙ্গকে পালন করচে। অতএব শক্তি আয়ুরূপে শরীরকে অনাগত পরিণামের দিকে নিয়ে

যাচ্চে এবং মঙ্গলরূপে তাকে অখণ্ড সমগ্রতায় বন্ধন করচে, ধারণ করচে।

এই শক্তির প্রকাশ শুধু যে মঙ্গলে তা ত নয়, কেবল যে তার দ্বারা যন্ত্রের মত রক্ষাকার্য্য চলে যাচ্চে তা নয় এর মধ্যে আবার একটি আনন্দ রয়েছে।

আয়ুর মধ্যে আনন্দ আছে—সমগ্র শরীরের মঙ্গলের মধ্যে স্বাস্থ্যের মধ্যে একটি আনন্দ আছে।

এই আনন্দকে ভাগ করলে দুটি জিনিষ পাওয়া যায় একটি হচ্চে জ্ঞান এবং আর একটি প্রেম।

আমার মধ্যে যে একটি সমগ্রতা আছে তার সঙ্গে জ্ঞান আছে—সে জানচে আমি হচ্চি আমি ; আমি হচ্চি একটি সম্পূর্ণ আছি।

শুধু জানচে নয় এই জানায় তার একটি প্রীতি আছে। এই একটি সম্পূর্ণতাকে সে এত ভালবাসে যে এর কোনো ক্ষতি সে

সহ্য করতে পারে না। এর মঙ্গলে তার লাভ, এর সেবায় তার আনন্দ।

তাহলে দেখ্‌তে পাচ্চি, শক্তি একটি সমগ্রতাকে বাঁধ্‌চে, রাখচে এবং তাকে অহরহ একটি ভাবী সম্পূর্ণতার দিকে চালনা করে নিয়ে যাচ্চে।

তার পরে দেখ্‌তে পাচ্চি এই যে সমগ্রতা যার মধ্যে একটি সক্রিয় শক্তি অংশ প্রত্যংশকে এক করে রয়েছে, অতীত অনাগতকে এক করে রয়েছে—সেই শক্তির মধ্যে কেবল যে মঙ্গল রয়েছে অর্থাৎ সত্য কেবল সমগ্র আকারে রক্ষা পাচ্চে ও পরিণতি লাভ করচে তা নয়—তার মধ্যে একটি আনন্দ রয়েছে। অর্থাৎ তার মধ্যে একটি সমগ্রতার জ্ঞান এবং সমগ্রতার প্রেম আছে। সে সমস্তকে জানে এবং সমস্তকে ভালবাসে।

যেটি আমার নিজের মধ্যে দেখ্‌চি—ঠিক এইটেই আবার সমাজের মধ্যে দেখ্‌চি।

সমাজ-সত্তার ভিতরে একটি শক্তি বর্ত্তমান, যা সমাজকে কেবলই বর্ত্তমানে আবদ্ধ করচে না তাকে তার ভাবী পরিণতির দিকে নিয়ে যাচ্চে। শুধু তাই নয়, সমাজস্থ প্রত্যেকের স্বার্থকে সকলের স্বার্থ এবং সকলের স্বার্থকে প্রত্যেকের স্বার্থ করে তুলচে।

কিন্তু এই ব্যক্তিগত স্বার্থকে সমষ্টিগত মঙ্গলে পরিণত করাটা যে কেবল যন্ত্রবৎ জড় শাসনে ঘটে উঠ্‌চে তা নয়। এর মধ্যে প্রেম আছে। মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনে একটা রস আছে। স্নেহ প্রেম দয়া দাক্ষিণ্য আমাদের পরস্পারের যোগকে স্বেচ্ছাকৃত আনন্দময় অর্থাৎ জ্ঞান ও প্রেমময় যোগরূপে জাগিয়ে তুলচে। আমরা দায়ে পড়ে নয় আনন্দের সঙ্গে স্বার্থ বিসর্জ্জন করচি। মা ইচ্ছা করেই সন্তানের সেবা করচে; মানুষ অন্ধভাবে নয় সজ্ঞানে প্রেমের দ্বারাই সমাজের হিত করচে। এই যে বৃহৎ আমি, সামাজিক আমি,

স্বাদেশিক আমি, মানবিক আমি, এর প্রেমের জোর এত যে, এই চৈতন্য যাকে যথার্থভাবে অধিকার করে সে এই বৃহতের প্রেমে নিজের ক্ষুদ্র আমির সুখ দুঃখ জীবন মৃত্যু সমস্ত অকাতরে তুচ্ছ করে। সমগ্রতার মধ্যে এতই আনন্দ;—বিচ্ছিন্নতার মধ্যেই দুঃখ দুর্ব্বলতা। তাই উপনিষৎ বলেছেন ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি।

বিশ্বব্যাপী সমগ্রতার মধ্যে ব্রহ্মের শক্তি কেবল যে সত্যের সত্য ও মঙ্গলের মঙ্গলরূপে আছে তা নয় সেই শক্তি অপরিমেয় আনন্দ-রূপে বিরাজ করচে। এই বিশ্বের সমগ্রতাকে ব্রহ্ম জ্ঞানের দ্বারা পূর্ণ করে এবং প্রেমের দ্বারা আলিঙ্গন করে রয়েছেন। তাঁর সেই জ্ঞান এবং সেই প্রেম চিরনির্ঝরধারারূপে জীবাত্মার মধ্যে দিয়া প্রবাহিত হয়ে চলেছে—কোনোদিন সে আর নিঃশেষ হল না।

এই জন্যেই পরমাত্মার সঙ্গে আত্মার যে

সমগ্র এক

মিলন সে জ্ঞান প্রেম কর্ম্মের মিলন—সেই মিলনই আনন্দের মিলন। সম্পূর্ণের সঙ্গে মিল্‌তে গেলে সম্পূর্ণতার দ্বারাই মিল্‌তে হবে—তবেই আমাদের যা কিছু আছে সমস্তই চরিতার্থ হবে।

১৯শে চৈত্র

আত্মপ্রত্যয়

আমার দেহ প্রাণ চৈতন্য বুদ্ধি হৃদয় সমস্তটা নিয়ে আমি একটি এক। এই যে সমগ্রতা সম্পূর্ণতা, এ একটি এক বস্তু বলেই নিজেকে জানে এবং নিজেকে ভালবাসে।

শুধু তাই নয় এই জন্য সর্ব্বত্রই সে এককে সন্ধান করে এবং এককে পেলেই আনন্দিত হয়। বিচ্ছিন্নতা তাকে ক্লেশ দেয়—সে সম্পূর্ণতাকে চায়।

বস্তুত সে যা কিছু চায় তা কোনো না কোনো রূপে এই সম্পূর্ণতার সন্ধান। সে নিজের একের সঙ্গে চারিদিকের বহুকে বেঁধে নিয়ে ক্ষুদ্র এককে বৃহত্তর এক করে তুলতে চায়।

আমরা প্রত্যেকে নিজের মধ্যে এই যে ঐক্যের সম্পূর্ণতা লাভ করেছি এরই শক্তিতে

আমরা জগতের আর সমস্ত ঐক্য উপলব্ধি করতে পারি। আমরা সমাজকে এক বলে বুঝতে পারি, মানবকে এক বলে বুঝতে পারি, সমস্ত বিশ্বকে এক বলে বুঝতে পারি—এমন কি, সেই রকম এক করে যাকে না বুঝতে পারি তার তাৎপর্য্য পাইনে—তাকে নিয়ে আমাদের বুদ্ধি কেবল হাৎড়ে বেড়াতে থাকে।

অতএব আমরা যে পরম এককে খুঁজচি সে কেবল আমাদের নিজের এই একের তাগিদেই। এই এক নিজের ঐক্যকে সেই পর্য্যন্ত না নিয়ে গিয়ে মাঝখানে কিছুতেই থাম্‌তে পারে না।

আমরা সমাজকে যে এক বলে জানি সেই জানবার ভিত্তি হচ্চে আমাদের আত্মা—মানবকে এক বলে জানি সেই জানার ভিত্তি হচ্চে এই আত্মা—বিশ্বকে যে এক বলে জানি তারও ভিত্তি হচ্চে এই আত্মা এবং পরমাত্মাকে যে অদ্বৈতম্‌ বলে জানি তারও ভিত্তি

হচ্চে এই আত্মা। এই জন্যই উপনিষৎ বলেন সাধক "আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি" আত্মাতেই পরমাত্মাকে দেখেন। কারণ আত্মাতে যে ঐক্য আছে সেই ঐক্যই পরম ঐক্যকে খোঁজে এবং পরম ঐক্যকে পায়। যে জ্ঞান তার নিজের ঐক্যকে আশ্রয় করে আত্মজ্ঞান হয়ে আছে সেই জ্ঞানই পরমাত্মার পরম জ্ঞানের মধ্যে চরম আশ্রয় পায়। এই জন্যই পরমাত্মাকে "একাত্মপ্রত্যয়সারং" বলা হয়েছে— অর্থাৎ নিজের প্রতি আত্মার যে একটি সহজ প্রত্যয় আছে সেই প্রত্যয়েরই সার হচ্চেন তিনি—আমাদের আত্মা যে স্বভাবতই নিজেকে এক বলে জানে সেই এক জানারই সার হচ্চে পরম এককে জানা। তেমনি আমাদের যে একটি আত্মপ্রেম আছে, আত্মাতে আত্মার আনন্দ, এই আনন্দই হচ্চে মানবাত্মার প্রতি প্রেমের ভিত্তি, বিশ্বাত্মার প্রতি প্রেমের ভিত্তি, পরমাত্মার প্রতি প্রেমের ভিত্তি। অর্থাৎ

এই আত্মপ্রেমেরই পরিপূর্ণতম সত্যতম বিকাশ হচ্চে পরমাত্মার প্রতি প্রেম—সেই ভূমানন্দেই আত্মার আনন্দের পরিণতি। আমাদের আত্মপ্রেমের চরম সেই পরমাত্মায় আনন্দ। তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতর যদয়মাত্মা।

২১ চৈত্র।

ধীর যুক্তাত্মা

এই কথাটিকে আলোচনা করে কেবল কঠিন করে তোলা হচ্চে। অথচ এইটিই আমাদের সকলের চেয়ে সহজ কথা—একে-বারে গোড়াকার প্রথম কথা এবং শেষের শেষ কথা। আমরা নিজের মধ্যে একটি এক পেয়েছি এবং এককেই আমরা বহুর মধ্যে সর্ব্বত্রই খুঁজে বেড়াচ্ছি। এমন কি, শিশু যখন নানা জিনিষকে ছুঁয়ে শুঁকে খেয়ে দেখবার জন্যে চারিদিকে হাত বাড়াচ্চে তখনো সে সেই এককেই খুঁজে বেড়াচ্চে। আমরাও শিশুরই মত নানা জিনিষকে ছুঁচ্চি, শুঁকচি, মুখে দিচ্চি, তাকে আঘাত করচি তার থেকে আঘাত পাচ্চি, তাকে জমাচ্চি এবং তাকে অ.বর্জ্জনার মত ফেলে দিচ্চি এই সমস্ত পরীক্ষা এই সমস্ত চেষ্টার ভিতর দিয়ে সমস্ত

দুঃখে সমস্ত লাভে আমরা সেই এককেই চাচ্চি। আমাদের জ্ঞান একে পৌঁছতে চায়, আমাদের প্রেম একে মিল্‌তে চায়। এ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো কথা নেই।

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে—আনন্দ আপনাকে নানারূপে নানাকালে প্রকাশ করচেন—আমরা সেই নানারূপকেই কেবল দেখ্‌চি কিন্তু আমাদের আত্মা দেখ্‌তে চায় নানার ভিতর দিয়ে সেই মূল এক আনন্দকে। যতক্ষণ সেই মূল আনন্দের কোনো আভাস না দেখি ততক্ষণ কেবলি বস্তুর পর বস্তু, ঘটনার পর ঘটনা আমাদের ক্লান্ত করে ক্লিষ্ট করে আমাদের অন্তহীন পথে ঘুরিয়ে মারে। আমাদের বিজ্ঞান সমস্ত বস্তুর মধ্যে এক সত্যকে খুঁজ্‌চে আমাদের ইতিহাস সমস্ত ঘটনার মধ্যে এক অভিপ্রায়কে খুঁজ্‌চে, আমাদের প্রেম সমস্ত সত্তার মধ্যে এক আনন্দকে খুঁজ্‌চে। নইলে সে কোনোখানেই

বল্‌তে পারচে না, ওঁ—বল্‌তে পারচে না, হাঁ, পাওয়া গেল।

আমরা যখন একটা অন্ধকার ঘরে আমাদের প্রার্থনীয় বস্তুকে খুঁজে বেড়াই তখন চারদিকে মাথা ঠুক্‌তে থাকি উঁচট্‌ খেতে থাকি, তখন কত ছোট জিনিষকে বড় মনে করি, কত তুচ্ছ জিনিষকে বহুমূল্য বলে মনে করি, কত জিনিষকে আঁকড়ে ধরে বলি এই ত পেয়েছি—তার পরে দেখি মুঠোর মধ্যেই সেটা গুঁড়িয়ে ধুলো হয়ে যায়।

আসল কথা এই অন্ধকারে আমি জানিই নে আমি কাকে চাচ্চি। কিন্তু যেমনি একটি আলো জ্বালা হয় অমনি এক মুহূর্ত্তেই সমস্ত সহজ হয়ে যায়—অমনি এতদিনের এত খোঁজা এত মাথা ঠোকার পরে এক পলকেই জান্‌তে পারি যে যা-সমস্ত আমার হাতে ঠেকছিল তাই আমার প্রার্থনীয় জিনিষ নয়। যে মা এই সমস্ত ঘরটি সাজিয়ে চুপ করে বসে ছিলেন

তিনিই আমার যথার্থ কামনার ধন। যেমনি আলোটি জ্বল্‌ল অমনি সব জিনিষ ছেড়ে দু' হাত বাড়িয়ে ছুটে তাঁর কাছে গেলুম।

অথচ যাকে পাবামাত্রই অমনি তাঁর সঙ্গে সব জিনিষকেই একত্রে পাওয়া গেল—কোনো বিশেষ জিনিষ স্বতন্ত্র হয়ে আমার পথের বাধারূপে আমাকে আটক করলে না—মাকে জান্‌বামাত্র মায়ের এই সাজানো ঘরটি আমারই হয়ে গেল। তখন ঘরের সমস্ত আসবাব-পত্রের মধ্যে আমার সঞ্চরণ অবাধ হয়ে উঠল—তখন যে জিনিষের ঠিক যে ব্যবহার তা আমার আয়ত্ত হয়ে গেল—তখন জিনিষ-গুলো আমাকে অধিকার করলনা, আমিই তাদের অধিকার করলুম।

তাই বলছিলুম কি জ্ঞানে কি প্রেমে কি কর্ম্মে সেই এককে সেই আসল জিনিষটিকে পেলেই সমস্তই সহজ হয়ে যায়—জিনিষের সমস্ত ভার এক মুহূর্ত্তে লাঘব হয়ে যায়।

সাঁতারটি যেমনি জেনেছি অমনি অগাধ জলে বিহারও আমার পক্ষে যেন স্বাভাবিক হয়ে যায়—তখন অতল জলে ডুব দিলেও বিনাশে তলিয়ে যাইনে—আপনি ভেসে উঠি। এই সাঁতারটি না জান্‌লেই জল প্রতিপদে আমাকে বাধা দেয় আমাকে মারতে চায় ;—যে জলে সঞ্চরণ সাঁতার জান্‌লে আমার পক্ষে লীলা আমার পক্ষে আনন্দ, সাঁতার না জান্‌লে সেই জলে সঞ্চরণই আমার পক্ষে দুঃখ আমার পক্ষে মৃত্যু। তখন অল্প জলেও হাত পা ছুঁড়ে হাঁস ফাস্ করে ক্লান্ত হয়ে পড়ি।

আমাদের আসল জান্‌বার বিষয়কে পাবার বিষয়কে যেমনি লাভ করি অমনি এই সংসারের বিচিত্রতা আর আমাদের বাঁধতে পারে না, ঠেকাতে পারে না মারতে পারে না। তখন, পূর্ব্বে যা বিভীষিকা ছিল এখন সেইটেই সহজ হয়ে যায়—সংসারে তখন আমরা মুক্ত ভাবে আনন্দ পাই। সংসার তখন আমাদের

অধিকার করে না, আমরাই সংসারকে অধিকার করি। তখন, পূর্ব্বে পদে পদে আমাদের যে আক্ষেপ বিক্ষেপ যে শক্তির অপব্যয় ছিল সেটা কেটে যায়।

সেই জন্যই উপনিষৎ বলেছেন—তে সর্ব্বগং সর্ব্বতঃ প্রাপ্য ধীরা যুক্তাত্মানঃ সর্ব্বমেবাবিশন্তি—সেই সর্ব্বব্যাপীকে যাঁরা সকল দিক থেকেই পেয়েছেন তাঁরা ধীর হয়ে যুক্তাত্মা হয়ে সর্ব্বত্রই প্রবেশ করেন। প্রথমে তাঁরা ধৈর্য্য লাভ করেন—আর তাঁরা নানা বিষয় ও নানা ব্যাপারের মধ্যে কেবলি বিক্ষিপ্ত হয়ে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে বেড়ান না—তাঁরা অপ্রগল্‌ভ অপ্রমত্ত ধীর হন—তাঁরা যুক্তাত্মা হন, সেই পরম একের সঙ্গে যোগযুক্ত হন—নিজেকে কোনো অহঙ্কার কোনো আসক্তি দ্বারা স্বতন্ত্র বিচ্ছিন্ন করেন না—একের সঙ্গে মিলিত হয়ে আনন্দে বিশ্বের সমস্ত বহুর মধ্যে প্রবেশ করেন—সমস্ত বহু তখন তাঁদের পথ ছেড়ে দেয়।

সেই সকল ধীর সেই সকল যুক্তাত্মাদের প্রণাম করে তাঁদেরই পথ আমরা অনুসরণ করব। সেই হচ্চে একের সঙ্গে যোগের পথ, সেই হচ্চে সকলের মধ্যেই প্রবেশের পথ—জ্ঞান, প্রেম এবং কর্ম্মের চরম পরিতৃপ্তির পথ।

২২শে চৈত্র

শক্ত ও সহজ

সাধনার দুই অঙ্গ আছে। একটি ধরে রাখা আর একটি ছেড়ে দেওয়া। এক জায়গায় শক্ত হওয়া, আর এক জায়গায় সহজ হওয়া।

জাহাজ যে চলে তার দুটি অঙ্গ আছে। একটি হচ্ছে হাল, আর একটি হচ্ছে পাল। হাল খুব শক্ত করেই ধরে রাখ্‌তে হবে। ধ্রুবতারার দিকে লক্ষ্য স্থির রেখে সিধে পথ ধরে চলা চাই। এর জন্যে দিক্‌ জানা দরকার —নক্ষত্র পরিচয় হওয়া চাই—কোন্‌ খানে বিপদ কোন্‌ খানে সুযোগ সে সমস্ত সর্ব্বদা মন দিয়ে বুঝে না চল্লে চল্‌বে না। এর জন্যে অহরহ সচেষ্ট সতর্কতা এবং দৃঢ়তার প্রয়োজন। এর জন্যে জ্ঞান এবং শক্তি চাই।

আর একটি কাজ হচ্ছে অনুকূল হাওয়ার কাছে জাহাজকে সমর্পণ করা! জাহাজের যত পাল আছে সমস্তকে এমন করে ছড়িয়ে ধরা যে বাতাসের সুযোগ হতে সে যেন লেশ-মাত্র বঞ্চিত না হয়।

আধ্যাত্মিক সাধনাতেও তেমনি যেমন একদিকে নিজের জ্ঞানকে বিশুদ্ধ এবং শক্তিকে সচেষ্ট রাখ্‌তে হবে তেমনি আর একদিকে ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিবেদন করে দিতে হবে। তাঁর মধ্যে একেবারে সহজ হয়ে যেতে হবে।

নিজেকে নিয়মের পথে দৃঢ় করে ধরে রাখবার সাধনা অনেক জায়গায় দেখা যায় কিন্তু নিজেকে তাঁর হাতে সমর্পণ করে দেবার সাধনা অল্পই দেখ্‌তে পাই। এখানেও মানুষের যেন একটা কৃপণতা আছে। সে নিজেকে নিজের হাতে রাখ্‌তে চায়, ছাড়তে চায় না। একটা কোনো কঠোর ব্রতে সে প্রতিদিন

নিজের শক্তির পরিচয় পায়—প্রতিদিন একটা হিসাব পেতে থাকে, যে, নিয়ম দৃঢ় রেখে এতখানি চলা হল; এতেই তার একটা বিশেষ অভিমানের আনন্দ আছে।

নিজের জীবনকে ঈশ্বরের কাছে নিবেদন করে দেবার এ মানে নয় যে, আমি যা করচি সমস্তই তিনি করচেন এইটি কল্পনা করা। করচি কাজ আমি, অথচ নিচ্চি তাঁর নাম, এবং দায়িক করচি তাঁকে—এমন দুর্বিপাক না যেন ঘটে।

ঈশ্বরের হাওয়ার কাছে জীবনটাকে একেবারে ঠিক করে ধরে রাখ্‌তে হবে। সেটিকে সম্পূর্ণ মান্‌তে হবে। কাৎ হয়ে সেটিকে পাশ কাটিয়ে চল্লে হবে না। তাঁর আহ্বান তাঁর প্রেরণাকে পুরাপূরি গ্রহণ করবার মুখে জীবন প্রতিমুহূর্ত্তে যেন আপনাকে প্রসারিত করে রাখে। "কি ইচ্ছা, প্রভু, কি আদেশ—" এই প্রশ্নটিকে জাগ্রত করে রেখে সে যেন সর্ব্বদা প্রস্তুত হয়ে থাকে। যা শ্রেয় তা যেন

সহজেই তাকে চালায় এবং শেষ পর্য্যন্তই তাকে নিয়ে যায়।

জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ
জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।

এ শ্লোকের মানে এমন নয় যে আমি ধর্ম্মেই থাকি আর অধর্ম্মেই থাকি তুমি আমাকে যেমন চালাচ্চ আমি তেমনি চল্‌চি। এর ভাব এই যে আমার প্রবৃত্তির উপরেই যদি আমি ভার দিই তবে সে আমাকে ধর্ম্মের দিকে নিয়ে যায় না অধর্ম্ম থেকে নিরস্ত করে না— তাই হে প্রভু, স্থির করেছি তোমাকেই আমি হৃদয়ে রাখ্‌ব এবং তুমি আমাকে যেদিকে চালাবে সেই দিকে চল্‌ব। স্বার্থ আমাকে যেদিকে চালাতে চায় সেদিকে চলবনা— অহঙ্কার আমাকে যে পথ থেকে নিবৃত্ত করতে চায় আমি সে পথ থেকে নিবৃত্ত হবনা।

অতএব তাঁকে হৃদয়ের মধ্যে স্থাপিত করে তাঁর হাতে নিজের ভার সমর্পণ করা, প্রত্যহ আমাদের ইচ্ছাশক্তির এই একটিমাত্র সাধনা হোক্।

এইটি করতে গেলে গোড়াতেই অহঙ্কারকে তার চূড়ার উপর থেকে একেবারে নামিয়ে আন্‌তে হবে। পৃথিবীর সকলের সঙ্গে সমান হও—সকলের পিছনে এসে দাঁড়াও; সকলের নীচে গিয়ে বস—তাতে কোনো ক্ষতি নেই। তোমার দীনতা ঈশ্বরের প্রসাদে পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক্ তোমার নম্রতা সুমধুর অমৃত ফলভারে সার্থক হোক্। সর্ব্বদা লড়াই করে নিজের জন্যে ঐ একটুকখানি স্বতন্ত্র জায়গা বাঁচিয়ে রাখবার কি দরকার—তার কি মূল্য? জগতের সকলের সমান হয়ে বস্‌তে লজ্জা কোরোনা—সেই খানেই তিনি বসে আছেন। যেখানে সকলের চেয়ে উঁচু হয়ে থাকবার জন্যে তুমি একলা বসে আছ সেখানে তাঁর স্থান অতি সঙ্কীর্ণ।

যতদিন তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ না করবে ততদিন তোমার হার-জিত তোমার সুখদুঃখ ঢেউয়ের মত কেবলি টলাবে কেবলি ঘোরাবে —প্রত্যেকটার পুরো আঘাত তোমাকে নিতে হবে। যখন তোমার পালে তাঁর হাওয়া লাগবে—তখন তরঙ্গ সমানই থাক্‌বে কিন্তু তুমি হু হু করে চলে যাবে—তখন সেই তরঙ্গ আনন্দের তরঙ্গ। তখন প্রত্যেক তরঙ্গটি কেবল তোমাকে নমস্কার করতে থাক্‌বে এবং এই কথাটিরই প্রমাণ দেবে যে তুমি তাঁকে আত্মসমর্পণ করেছ।

তাই বলছিলুম জীবনযাত্রার সাধনায় নিজের শক্তির চর্চ্চা যতই করি—ঈশ্বরের চিরপ্রবাহিত অনুকূল দক্ষিণ বায়ুর কাছে সমস্ত পালগুলি একেবারেই পূর্ণভাবে ছড়িয়ে দেবার কথাটা না ভুলি যেন।

২৪শে চৈত্র

নমস্তেঽস্তু

কোন লতা গোল গোল আঁকড়ি দিয়ে আপনার আশ্রয়কে বেষ্টন করে, কোনো লতা সরু সরু শিকড় মেলে দিয়ে আশ্রয়কে চেপে ধরে, কোনো লতা নিজের সমস্ত দেহকে দিয়েই তার অবলম্বনকে ঘিরে ফেলে।

আমরাও যে সকল সম্বন্ধ দিয়ে ঈশ্বরকে ধরব তা একরকম নয়। আমরা তাঁকে পিতাভাবেও আশ্রয় করতে পারি, প্রভুভাবেও পারি, বন্ধুভাবেও পারি। জগতে যতরকম সম্বন্ধসূত্রেই আমরা নিজেকে বাঁধি সমস্তের মূলে তিনিই আছেন—যে রসের দ্বারা সেই সেই সকল সম্বন্ধ পুষ্ট হয় সে রস তাঁরই ;—এই জন্যে সব সম্বন্ধই তাঁতে খাটতে পারে, সকল রকম ভাব দিয়েই মানুষ তাঁকে পেতে পারে।

সব সম্বন্ধের মধ্যে প্রথম সম্বন্ধ হচ্চে পিতাপুত্রের সম্বন্ধ।

পিতা যত বড়ই হোন্ আর পুত্র যত ছোটই হোক্—উভয়ের মধ্যে শক্তির যতই বৈষম্য থাক্ তবু উভয়ের মধ্যে গভীরতর ঐক্য আছে। সেই ঐক্যটির যোগেই এতটুকু ছেলে তার এত বড় বাপকে লাভ করে।

ঈশ্বরকেও যদি পেতে চাই তবে তাঁকে একটি কোনো সম্বন্ধের ভিতর দিয়ে পেতে হবে—নইলে তিনি আমাদের কাছে কেবলমাত্র একটি দর্শনের তত্ত্ব, ন্যায়শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত হয়ে থাক্‌বেন, আমাদের আপন হয়ে উঠ্‌বেন না।

তিনি ত কেবল আমাদের বুদ্ধির বিষয় নন, তিনি তার চেয়ে অনেক বেশী—তিনি আমাদের আপন। তিনি যদি আমাদের আপন না হতেন তা হলে সংসারে কেউ আমাদের আপন হত না—তা হলে আপন

কথাটার কোনো মানেই থাকত না। তিনি যেমন বৃহৎ সূর্য্যকে এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর আপন করে' এত লক্ষ যোজন ক্রোশের দূরত্ব ঘুচিয়ে মাঝখানে রয়েচেন তেমনি তিনিই নিজে এক মানুষের সঙ্গে আর এক মানুষের সম্বন্ধরূপে বিরাজ করচেন। নইলে একের সঙ্গে আরের ব্যবধান যে অনন্ত; মাঝখানে যদি অনন্ত মিলনের সেতু না থাক্‌তেন তাহলে এই অনন্ত ব্যবধান পার হতুম কি করে!

অতএব তিনি দুরূহ তত্ত্বকথা নন্ তিনি অত্যন্ত আপন। সকল আপনের মধ্যেই তিনি একমাত্র চিরন্তন অখণ্ড আপন। গাছের ফলকে তিনি যে কেবল একটি সত্যরূপে গাছে ঝুলিয়ে রেখেছেন তা নয়, স্বাদে গন্ধে শোভায় তিনি বিশেষরূপে তাকে আমার আপন করে রেখেছেন—তিনিই আমার আপন বলে ফলকে নানা রসে আমার আপন করে-ছেন—নইলে ফল নামক সত্যটিকে আমি

কোনোদিক থেকেই কোনো রকমেই এতটুকুও নাগাল পেতুম না।

কিন্তু আপন যে কতদূর পর্য্যন্ত যায়, কত গভীরতা পর্য্যন্ত, তা তিনি মানুষের সম্বন্ধে মানুষকে দেখিয়েছেন—শরীর মন হৃদয় সর্ব্বত্র তার প্রবেশ, কোথাও তার বিচ্ছেদ নেই, বিরহ এবং মৃত্যুও তাকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে না।

সেই জন্যে মানুষের এই সম্বন্ধগুলির মধ্যদিয়েই আমরা কতকটা উপলব্ধি করতে পারি, নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে যিনি আমাদের নিত্যকালের আপন তিনি আমাদের কি? সেই তিনি তাঁকে সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম বলে আমাদের শেষ কথা বলা হয় না—তার চেয়ে চরমতর অন্তরতর কথা হচ্ছে, তুমি আমার আপন, তুমি আমার মাতা, আমার পিতা, আমার বন্ধু আমার প্রভু, আমার বিদ্যা, আমার ধন, ত্বমেব সর্ব্বং মম দেবদেব। তুমি

আমার এবং আমি তোমার, তোমাতে আমাতে এই যে যোগ, এই যোগটিই আমার সকলের চেয়ে বড় সত্য, আমার সকলের চেয়ে বড় সম্পদ। তুমি আমার মহত্তম সত্যতম আপনস্বরূপ।

ঈশ্বরের সঙ্গে এই যোগ উপলব্ধি করবার একটি মন্ত্র হচ্ছে "পিতা নোঽসি" তুমি আমাদের পিতা। যিনি অনন্ত সত্য তাঁকে আমাদের আপন সত্য করবার এই একটি মন্ত্র—তুমি আমাদের পিতা।

আমি ছোট, তুমি ব্রহ্ম, তবু তোমাতে আমাতে মিল আছে, তুমি পিতা। আমি অবোধ, তুমি অনন্ত জ্ঞান, তবু তোমাতে আমাতে মিল আছে, তুমি পিতা।

এই যে যোগ এই যোগটি দিয়ে তোমাতে আমাতে বিশেষভাবে যাতায়াত, তোমাতে আমাতে বিশেষভাবে দেনাপাওনা। এই যোগটিকে যেন আমি সম্পূর্ণ সজ্ঞানে সম্পূর্ণ

সবলে অবলম্বন করি। তাই আমার প্রার্থনা এই যে, "পিতা নো বোধি" তুমি যে পিতা আমাকে সেই বোধটি দাও। তুমি ত "পিতা নোঽসি" পিতা আছ—কিন্তু শুধু আছ বল্লে ত হবে না—"পিতা নো বোধি" তুমি আমার পিতা হয়ে আছ এই বোধটি আমাকে দাও।

আমার চৈতন্য ও বুদ্ধি যোগে যে-কিছু জ্ঞান আমি পাচ্চি সমস্তই তাঁর কাছ থেকে পাচ্চি "ধিয়ো যোনঃ প্রচোদয়াৎ" যিনি আমাদের ধীশক্তি সকল প্রেরণ করচেন। যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে অখণ্ড এক করে রয়েছেন—তাঁর কাছ থেকে ছাড়া কোনো জ্ঞান, আর কোথা পাব! কিন্তু সেই সঙ্গে যেন এই বোধটুকুও পাই যে তিনিই দিচ্চেন।

তিনিই পিতারূপে আমাকে জ্ঞান দিচ্চেন এই বোধটুকু আমার অন্তরে থাকলে তবেই তাঁকে আমি যথার্থভাবে নমস্কার করতে পারি। আমি সমস্তই তাঁর কাছথেকে নিচ্চি,

পাচ্চি, তবু তাঁকে নমস্কার করতে পারচিনে, আমার মন শক্ত হয়েই আছে, মাথা উদ্ধত হয়েই রয়েছে। কেননা তাঁর সঙ্গে আমার যে যোগ সেটা আমার বোধে খুঁজে পাচ্চিনে।

তাই আমাদের প্রার্থনা এই যে, "নমস্তেঽস্তু"—তোমাতে আমাদের নমস্কারটি যেন হয়—সেটি যেন নম্রতায় আত্মসমর্পণে পরিপূর্ণ হয়ে তোমার পায়ের কাছে এসে নামে—আমার সমস্ত জীবন যেন তোমার প্রতি নমস্কাররূপে পরিণত হয়।

তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধই এই যে, তুমি আমাকে দেবে আর আমি নমস্কারে নত হয়ে পড়ে তা গ্রহণ করব। এই নমস্কারটি অতি মধুর ; এ জলভারনত মেঘের মত, ফল-ভারনত শাখার মত রসে ও মঙ্গলে পরিপূর্ণ। এই নমস্কারের দ্বারা জীবন কল্যাণে ভরে ওঠে, সৌন্দর্য্যে উপ্‌চে পড়ে। এই নমস্কার যে কেবল নিবিড় মাধুর্য্য তা নয় এ প্রবল শক্তি।

এ যেমন অনায়াসে গ্রহণ করে ও বহন করে উদ্ধত অহঙ্কার তেমন করে পারে না। এ'কে কেউ পরাভূত করতে পারেনা। জীবন এই নমস্কারের দ্বারা সমস্ত আঘাত ক্ষতি বিপদ ও মৃত্যুর উপরে অতি সহজেই জয়ী হয়। এই নমস্কারের দ্বারা জীবনের সমস্ত ভার এক মুহূর্তে লঘু হয়ে যায়—পাপ তার উপর দিয়ে মুহূর্তকালীন বন্যার মত চলে যায় তাকে ভেঙে দিয়ে যেতে পারে না। এই জন্য প্রতিদিনই প্রার্থনা করি "নমস্তেঽস্তু"—তোমাতে আমার নমস্কার হোক্! সুখ আসুক দুঃখ আসুক "নমস্তেঽস্তু," মান আসুক অপমান আসুক নমস্তেঽস্তু—তুমি শিক্ষা দিচ্ছ, এই জেনে নমস্তেঽস্তু, তুমি রক্ষা করচ এই জেনে নমস্তেঽস্তু, তুমি নিত্য নিয়তই আমার কাছে আছ এই জেনে নমস্তেঽস্তু—তোমার গৌরবেই আমার একমাত্র গৌরব এই জেনেই নমস্তেঅস্তু—অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের

অনন্তকালের অধীশ্বর তুমিই পিতানোঽসি, এই জেনেই নমস্তেঽস্তু, নমস্তেঽস্তু। বিষয়কেই আশ্রয় বলে জানা ঘুচিয়ে দাও, নমস্তেঽস্তু, সংসারকে প্রবল বলে জানা ঘুচিয়ে দাও, নমস্তেঽস্তু, আমাকেই বড় বলে জানা ঘুচিয়ে দাও, নমস্তেঽস্তু! তোমাকেই যথার্থরূপে নমস্কার করে চিরদিনের মত পরিত্রাণ লাভ করি।

২৯শে চৈত্র।

মন্ত্রের বাঁধন

বীণার কোনো তার পিতলের, কোনো তার ইস্পাতের, কোনো তার মোটা, কোন তার সরু, কোনো তার মধ্যম সুরে বাঁধবার, কোনো তার পঞ্চমে। কিন্তু তবু বাঁধতে হবে—তার থেকে একটা কোনো বিশুদ্ধ সুর জাগিয়ে তুল্‌তে হবে, নইলে সব মাটি।

জগতে ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের কোনো বিশেষ আপন সম্বন্ধ স্থাপন করতে হবে। একটা কোনো বিশেষ সুর বাজাতে হবে।

সূর্য্য চন্দ্র তারা ওষধি বনস্পতি, সকলেই এই বিশাল বিশ্বসঙ্গীতে নিজের একটা না একটা বিশেষ সুর যোগ করে দিয়েছে;—মানুষের জীবনকেও কি এই চির-উদ্গীত সঙ্গীতে যোগ দিতে হবে না?

কিন্তু এখনো এই জীবনটাকে তারের

মত বাঁধিনি—এর মধ্যে এখনো কোনো গানের আবির্ভাব হয়নি। এ জীবন সূত্রবিচ্ছিন্ন বিচিত্র তুচ্ছতার মধ্যে অকৃতার্থ হয়ে আছে। যেমন করেই পারি এর একটি কোনো নিত্য সুরকে ধ্রুব করে তুলতে হবে।

তারকে বাঁধব কেমন করে?

ঈশ্বরের বীণায় অনেকগুলি বাঁধবার সম্বন্ধ আছে—তার মধ্যে নিজের মনের মত একটি কিছু স্থির করে নিতে হবে।

মন্ত্র জিনিষটি একটি বাঁধবার উপায়। মন্ত্রকে অবলম্বন করে আমরা মননের বিষয়কে মনের সঙ্গে বেঁধে রাখি। এ যেন বীণার কানের মত—তারকে এঁটে রাখে—খুলে পড়তে দেয় না।

বিবাহের সময় স্ত্রীপুরুষের কাপড়ে কাপড়ে গ্রন্থি বেঁধে দেয়—সেই সঙ্গে মন্ত্র পড়ে দেয়—সেই মন্ত্র মনের মধ্যেও গ্রন্থি বাঁধতে থাকে।

ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের যে গ্রন্থিবন্ধনের

প্রয়োজন আছে মন্ত্র তার সহায়তা করে। এই মন্ত্রকে অবলম্বন করে আমরা তাঁর সঙ্গে একটা কোনো বিশেষ সম্বন্ধকে পাকা করে নেব।

সেইরূপ একটি মন্ত্র হচ্চে "পিতা নোঽসি।"

এই সুরে জীবনটাকে বাঁধলে সমস্ত চিন্তায় ও কর্ম্মে একটি বিশেষ রাগিণী জেগে উঠ্‌বে। আমি তাঁর পুত্র এইটেই মূর্ত্তি ধরে আমার সমস্তের মধ্যেই এই কথাটাই প্রকাশ করবে যে আমি তাঁর পুত্র।

আজ আমি কিছুই প্রকাশ করচিনে। আহার করচি কাজ করচি বিশ্রাম করচি এই পর্য্যন্তই। কিন্তু অনন্ত কালে অনন্ত জগতে আমার পিতা যে আছেন তার কোনো লক্ষণই প্রকাশ পাচ্চেনা। অনন্তের সঙ্গে আজও আমার কোনো গ্রন্থি কোথাও বাঁধা হয়নি।

ঐ মন্ত্রটিকে দিয়ে জীবনের তার আজ বাঁধা যাক্। আহারে বিহারে শয়নে স্বপনে

ঐ মন্ত্রটি বারম্বার আমার মনের মধ্যে বাজতে থাক্ পিতা নোঽসি! জগতে আমার পিতা আছেন এই কথাটি সকলেই জানুক্ কারো কাছে গোপন না থাক্।

ভগবান যিশু ঐ সুরটিকে পৃথিবীতে বাজিয়ে গিয়েছেন। এমনি ঠিক করে তাঁর জীবনের তার বাঁধা ছিল যে মরণান্তিক যন্ত্রণার দুঃসহ আঘাতেও সেই তার লেশমাত্র বেসুর বলেনি—সে কেবলি বলেছে পিতা নোঽসি।

সেই যে সুরের আদর্শটি তিনি দেখিয়ে গেছেন সেই খাঁটি আদর্শের সঙ্গে একান্ত যত্নে মিশিয়ে তারটি বাঁধতে হবে—যাতে আর ভাবতে না হয়, যাতে সুখে দুঃখে প্রলোভনে আপনিই সে গেয়ে ওঠে পিতানোঽসি!

হে পিতা, আমি যে তোমার পুত্র এই সুরটি ঠিকমত প্রকাশ করা বড় কম কথা নয়। কেননা, আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ।

পুত্র যে পিতারই প্রকাশ। সন্তানের মধ্যে পিতাই যে স্বয়ং সম্ভূত হন। তোমারই অপাপবিদ্ধ আনন্দময় পরিপূর্ণতাকে যদি ব্যক্ত করে না তুল্‌তে পারি তবে ত এই সুর বাজ্‌বে না যে পিতানোঽসি।

সেইজন্যেই এই আমার প্রতিদিনের একান্ত প্রার্থনা হোক্—পিতা নো বোধি, নমস্তেঽস্তু!

২৭ শে চৈত্র

প্রাণ ও প্রেম

পিতানোঽসি এই মন্ত্রটি আমরা জীবনের মধ্যে গ্রহণ করব। কার কাছথেকে গ্রহণ করব? যিনি পিতা তাঁর কাছথেকেই গ্রহণ করব। তাঁকে বল্‌ব, তুমি যে পিতা, সে তুমিই আমাকে বুঝিয়ে দাও! আমার জীবনের সমস্ত ইতিহাসের ভিতর দিয়ে সমস্ত সুখ দুঃখের ভিতর দিয়ে বুঝিয়ে দাও!

পিতার সঙ্গে আমাদের যে সম্বন্ধ সে ত কোনো তৈরি করা সম্বন্ধ নয়। রাজার সঙ্গে প্রজার, প্রভুর সঙ্গে ভৃত্যের একটা পরস্পর বোঝাপড়া আছে—সেই বোঝপড়ার উপরেই তাদের সম্বন্ধ। কিন্তু পিতার সঙ্গে পুত্রের সম্বন্ধ বাহ্যিক নয় সে একেবারে আদিতম সম্বন্ধ। সে সম্বন্ধ পুত্রের অস্তিত্বের মূলে। অতএব এই গভীর আত্মীয় সম্বন্ধ কোনো বাহ্য

অনুষ্ঠান কোনো ক্রিয়াকলাপের দ্বারা রক্ষিত হয় না—কেবল ভক্তির দ্বারা এবং ভক্তিজনিত কর্ম্মের দ্বারাই এই সম্বন্ধকে স্বীকার করতে হয়।

পিতার সঙ্গে পুত্রের মূল সম্বন্ধটি কোথায়? প্রাণের মধ্যে। পিতার প্রাণই সন্তানের প্রাণে সঞ্চারিত।

কেনোপনিষৎ প্রশ্ন করেছেন—"কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতিযুক্ত?" প্রাণ কাহার দ্বারা তার প্রথম প্রৈতি (energy) লাভ করেছে? এই প্রশ্নের মধ্যেই উত্তরটি প্রচ্ছন্ন রয়েছে—যিনি মহাপ্রাণ তাঁর দ্বারা।

জগতে কোনো প্রাণই ত একটি সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে নিজের মধ্যে নিজে আবদ্ধ নয়। সমস্ত জগতের প্রাণের সঙ্গে তার যোগ। আমার এই শরীরের মধ্যে যে প্রাণের চেষ্টা চলচে সে ত কেবলমাত্র এই শরীরের নয়। জগৎজোড়া আকর্ষণ বিকর্ষণ, জগৎজোড়া

রাসায়নিক শক্তি, জল, বাতাস, আলোক ও উত্তাপ, এ'কে নিখিলপ্রাণের সঙ্গে যুক্ত করে রেখেছে। বিশ্বের প্রত্যেক অণুপরমাণুর মধ্যেও যে অবিশ্রাম চেষ্টা আছে আমার এই শরীরের চেষ্টাও সেই বিরাট প্রাণেরই একটি মাত্রা। সেইজন্যই উপনিষৎ বলেছেন—"যদিদং কিঞ্চ জগৎসর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্" বিশ্বে এই যা কিছু চল্‌চে সমস্তই প্রাণ হতে নিঃসৃত হয়ে প্রাণেই স্পন্দিত হচ্চে। এই প্রাণের স্পন্দন দূরতম নক্ষত্রেও যেমন আমার হৃৎপিণ্ডেও তেমন—ঠিক একই সুরে একই তালে।

প্রাণ কেবল শরীরের নয়। মনেরও প্রাণ আছে। মনের মধ্যেও চেষ্টা আছে। মন চল্‌চে, মন বাড়চে, মনের ভাঙাগড়া পরিবর্ত্তন হচ্চে। এই স্পন্দিত তরঙ্গিত মন কখনই কেবল আমার ক্ষুদ্র বেড়াটির মধ্যে আবদ্ধ নয়—ঐ বর্ত্তমান প্রাণের সঙ্গেই হাতধরাধরি করে

নিখিল বিশ্বে সে আন্দোলিত হচ্চে, নইলে আমি তাকে কোনোমতেই পেতে পারতুম না। মনের দ্বারা আমি সমস্ত জগতের মনের সঙ্গেই যুক্ত ;—সেই জন্যেই সর্ব্বত্র তার গতিবিধি। নইলে আমার এই একঘরে অন্ধ মন কেবল আমারই অন্ধকারাগারে পড়ে দিনরাত্রি কেঁদে মরত।

আমার মনপ্রাণ অবিচ্ছিন্নভাবে নিখিল বিশ্বের ভিতর দিয়ে সেই অনন্ত কারণের সঙ্গে যোগযুক্ত—প্রতিমুহূর্ত্তেই সেইখান হতে আমি প্রাণ, চৈতন্য, ধীশক্তি লাভ করচি এই কথাটিকে কেবল বিজ্ঞানে জানা নয় এই কথাটিকে ভক্তিদ্বারা উপলব্ধি করতে পারলে তবে ঐ মন্ত্র সার্থক হবে—"ওঁ পিতানোহসি।" আমার প্রাণের মধ্যে বিশ্বপ্রাণ, মনের মধ্যে বিশ্বমন আছে বল্লে এত বড় কথাটাকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করা হয় না, এ'কে বাইরেই বসিয়ে রাখা হয়। আমার প্রাণের মধ্যে পিতার প্রাণ

আমার মনের মধ্যে পিতার মন আছে এই কথাটি নিজেকে ভাল করে বলাতে হবে।

পিতার দিক থেকে কেবল যে আমাদের দিকে প্রাণ প্রবাহিত হচ্চে তা নয়—তাঁর দিক থেকে আমাদের দিকে অবিশ্রাম প্রেম সঞ্চারিত হচ্চে। আমাদের মধ্যে কেবল যে একটা চেষ্টা আছে গতি আছে তা নয়, একটা আনন্দ আছে—আমরা কেবল বেঁচে আছি কাজ করচি নয়, আমরা রস পাচ্চি। আমাদের দেখায় শোনায়, আহারে বিহারে, কাজে কর্ম্মে, মানুষের সঙ্গে নানাপ্রকার যোগে নানা সুখ নানা প্রেম।

এই রসটি কোথা থেকে পাচ্চি? এইটিই কি আমাদের মধ্যে বিচ্ছিন্ন? এটা কেবল আমার এই একটি ছোট কারখানাঘরের সুরঙ্গের মধ্যে অন্ধকারে তৈরি হচ্চে?

তা নয়। বিশ্বভুবনের মধ্যে সমস্তকে পরিপূর্ণ করে তিনি আনন্দিত। জলে স্থলে

আকাশে তিনি আনন্দময়। তাঁর সেই আনন্দকে সেই প্রেমকে তিনি নিয়তই প্রেরণ করচেন, সেইজন্যেই আমি বেঁচে থেকে আনন্দিত, কাজ করে আনন্দিত, জেনে আনন্দিত, মানুষের সঙ্গে নানা সম্বন্ধে আনন্দিত। তাঁরই প্রেমের তরঙ্গ আমাকে কেবলই স্পর্শ করচে, আঘাত করচে, সচেতন করচে।

এই যে অহোরাত্র সেই ভূমার প্রেম নানা বর্ণে গন্ধে গীতে নানা স্নেহে সখ্যে শ্রদ্ধায় জোয়ারের বেগের মত আমাদের মধ্যে এসে পড়চে এই বোধের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে যেন আমরা বলি, "ওঁ পিতানোঽসি।" কেবলি তিনি প্রাণে ও প্রেমে আমাকে ভরে দিচ্চেন এই অনুভূতিটি যেন আমরা না হারাই। এই অনুভূতি যাঁদের কাছে অত্যন্ত উজ্জ্বল ছিল তাঁরাই বলেছেন—"কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষহ্যে-

বানন্দয়াতি।" কেই বা কিছুমাত্র শরীর চেষ্টা প্রাণের চেষ্টা করত আকাশে যদি আনন্দ না থাকতেন—এই আনন্দই সকলকে আনন্দ দিচ্চেন।

২৮শে চৈত্র

ভয় ও আনন্দ

ওঁ পিতানোঽসি এই মন্ত্রে দুটি ভাবের সামঞ্জস্য আছে। এক দিকে পিতার সঙ্গে পুত্রের সাম্য আছে। পুত্রের মধ্যে পিতা আপনাকেই প্রকাশ করেছে।

আর এক দিকে পিতা হচ্চেন বড়, পুত্র ছোট।

এক দিকে অভেদের গৌরব, আর এক দিকে ভেদের প্রণতি। পিতার সঙ্গে অভেদ নিয়ে আমরা আনন্দ করতে পারি কিন্তু স্পর্দ্ধা করতে পারিনে। আমার যেখানে সীমা আছে সেখানে আমাকে মাথা নত করতে হবে।

কিন্তু এই নতির মধ্যে অপমান নেই। কেন না তিনি কেবলমাত্র আমার বড় নন তিনি আমার আপন, আমার পিতা। তিনি আমারই বড়, আমি তাঁরই ছোট। তাঁকে

প্রণাম করে আমি আমার বড় আমাকেই প্রণাম করি। এর মধ্যে বাইরের কোনো তাড়না নেই—জবরদস্তি নেই। যে বড়র মধ্যে আমি আছি, যে বড়র মধ্যেই পরিপূর্ণ সার্থকতা তাঁকে প্রণাম করাই একমাত্র স্বাভাবিক প্রণাম। কিছু পাব বলে প্রণাম নয়, কিছু দেব বলে প্রণাম নয়, ভয়ে প্রণাম নয়, জোরে প্রণাম নয়—আমারই অনন্ত গৌরবের উপলব্ধির কাছে প্রণাম। এই প্রণামটির মহত্ত্ব অনুভব করেই প্রার্থনা করা হয়েছে নমস্তেঽস্তু, তোমাতে আমার নমস্কার সত্য হয়ে উঠুক্।

তাঁকে পিতানোঽসি বলে স্বীকার করলে তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধের একটি পরিমাণ রক্ষা হয়—তাঁকে নিয়ে কেবল ভাবরসে প্রমত্ত হবার যে একটি উচ্ছৃঙ্খল আত্মবিস্মৃতি আছে সেটি আমাদের আক্রমণ করতে পারে না—সম্ভ্রমের দ্বারা আমাদের আনন্দ গাম্ভীর্য্য লাভ করে, অচঞ্চল গৌরব প্রাপ্ত হয়।

প্রাচীন বেদ সমস্ত মানব-সম্বন্ধের মধ্যে কেবল এই পিতার সম্বন্ধটিকেই ঈশ্বরের মধ্যে বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করেছেন—মাতার সম্বন্ধকেও সেখানে তাঁরা স্থান দেন নি।

কারণ, মাতার সম্বন্ধেও একদিকে যেন ওজন কম আছে, একদিকে সম্পূর্ণতার অভাব আছে।

মাতা সন্তানের সুখ দেখেন, আরাম দেখেন; তার ক্ষুধাতৃপ্তি করেন, তার শোকে সান্ত্বনা দেন, তার রোগে শুশ্রূষা করেন। এ সমস্তই সন্তানের উপস্থিত অভাব নিবৃত্তির প্রতিই লক্ষ্য করে।

পিতার দৃষ্টি সন্তানের সমস্ত জীবনের বৃহৎক্ষেত্রে। তার সমস্ত জীবন সমগ্রভাবে সার্থক হবে এই তিনি কামনা করেন। এই জন্যই সন্তানের আরাম ও সুখই তাঁর কাছে একান্ত নয়। এই জন্য তিনি সন্তানকে দুঃখও দেন—তাকে শাসন করেন—তাকে বঞ্চিত

করেন, যাতে নিয়ম লঙ্ঘন করে ভ্রষ্টতা প্রাপ্ত না হয় সেদিকে তিনি সর্ব্বদা সতর্ক থাকেন।

অর্থাৎ পিতার মধ্যে মাতার স্নেহ আছে কিন্তু সে স্নেহ সঙ্কীর্ণ সীমায় বদ্ধ নয় বলেই তাকে অতি প্রকট করে দেখা যায় না এবং তাকে নিয়ে যেমন ইচ্ছা খেলা চলে না।

সেই জন্যে পিতাকে নমস্কার করবার সময় বলা হয়েছে নমঃ সম্ভবায় চ ময়োভবায় চ— যিনি সুখকর তাঁকে নমস্কার যিনি কল্যাণকর তাঁকে নমস্কার।

পিতা কেবল আমাদের সুখের আয়োজন করেন না, তিনি মঙ্গলের বিধান করেন— সেই জন্যেই সুখেও তাঁকে নমস্কার, দুঃখেও তাঁকে নমস্কার। ঐখানেই পিতার পূর্ণতা; তিনি দুঃখ দেন।

উপনিষৎ একদিকে বলেছেন আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে—আনন্দ হতেই যা কিছু সমস্ত জন্মেছে, আবার আর একদিকে বলেছেন

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি, ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ, ইহার ভয়ে অগ্নি জ্বলচে, ইহার ভয়ে সূর্য্য তাপ দিচ্চে।

তাঁর আনন্দ উচ্ছৃঙ্খল আনন্দ নয়—তার মধ্যে একটি অমোঘ নিয়মের শাসন আছে—অনন্ত দেশে অনন্তকালে কোথাও একটি কণাও লেশমাত্র ভ্রষ্ট হতে পারে না। সেই অমোঘ নিয়মই হচ্চে ভয়—তার সঙ্গে কিছুমাত্র চাতুরী খাটে না—সে কোথাও কাউকে তিলমাত্র প্রশ্রয় দেয় না।

যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং
মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং—

এই যা কিছু জগৎ সমস্তই প্রাণ হতে নিঃসৃত হয়ে প্রাণেই কম্পিত হচ্চে—সেই যে প্রাণ, যাঁর থেকে সমস্ত উদ্ভূত হয়েছে এবং যাঁর মধ্যে সমস্তই চল্‌চে তিনি কি রকম? না, তিনি উদ্যত বজ্রের মত মহা ভয়ঙ্কর। সেই জন্যেই ত সমস্ত চল্‌চে—নইলে বিশ্বব্যবস্থা উন্মত্ত প্রলাপের মত অতি নিদারুণ হয়ে

উঠ্‌ত। আমাদের পিতা যে ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং এই ভয়ের দ্বারাই অনাদি কাল থেকে সর্ব্বত্র সকলের সীমা ঠিক আছে সর্ব্বত্র সকলের পরিমাণ রক্ষা হচ্চে।

আমাদেরও যেদিকটা চলবার দিক্‌, কি বাক্যে, কি ব্যবহারে সেই দিকে পিতা দাঁড়িয়ে আছেন মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং। সেদিকে কোনো ব্যত্যয় নেই কোনো স্খলনের ক্ষমা নেই, কোনো পাপের নিষ্কৃতি নেই।

অতএব আমরা যখন বলি পিতা নোঽসি— তার মধ্যে আদরের দাবি নেই, উন্মত্ততার প্রশ্রয় নেই। অত্যন্ত সংযত আত্মসংবৃত বিনম্র নমস্কার আছে। যে বলে পিতানোঽসি সে তাঁর সাম্‌নে "শান্তোদান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতঃ" হয়ে থাকে সে নিজেকে প্রত্যেক ক্ষুদ্র অধৈর্য্য ক্ষুদ্র আত্মবিস্মৃতি থেকে রক্ষা করে চল্‌তে থাকে।

২৯শে চৈত্র

নিয়ম ও মুক্তি

সুখ জিনিষটা কেবল আমার, কল্যাণ জিনিষটা সমস্ত জগতের। পিতার কাছে যখন প্রার্থনা করি যদ্‌ভদ্রং তন্ন আসুব, যা ভাল তাই আমাদের দাও, তার মানে হচ্চে সমস্ত জগতের ভাল আমাদের মধ্যে প্রেরণ কর। কারণ সেই ভালই আমার পক্ষেও সত্য ভাল, আমার পক্ষেও নিত্য ভাল। যা বিশ্বের ভাল, তাই আমার ভাল কারণ যিনি বিশ্বের পিতা তিনিই আমার পিতা।

যেখানে কল্যাণ নিয়ে অর্থাৎ বিশ্বের ভাল নিয়ে কথা সেখানে অত্যন্ত কড়া নিয়ম। সেখানে উপস্থিত সুখসুবিধা কিছুই খাটে না; সেখানে ব্যক্তিবিশেষের আরাম বিরামের স্থান নেই। সেখানে দুঃখও শ্রেয়, মৃত্যুও বরণীয়।

যেখানে বিশ্বের ভাল নিয়ে কথা সেখানে সমস্ত নিয়ম একেবারে শেষ পর্য্যন্ত মান্‌তেই হবে। সেখানে কোনো বন্ধন কোনো দায়কেই অস্বীকার করতে পারব না।

আমাদের পিতা এইখানেই মহদ্‌ভয়ং বজ্র-মুদ্যতং। এইখানেই তিনি পুত্রকে এক চুল প্রশ্রয় দেন না। বিশ্বের ভাগ থেকে একটি কণা হরণ করেও তিনি কোনো বিশেষ পুত্রের পাতে দেন না। এখানে কোনো স্তব স্তুতি অনুনয় বিনয় খাটে না।

তবে মুক্তি কাকে বলে? এই নিয়মকে পরিপূর্ণভাবে আত্মসাৎ করে নেওয়াকেই বলে মুক্তি। নিয়ম যখন কোনো জায়গায় আমার বাইরের জিনিষ হবে না সম্পূর্ণ আমার ভিতরকার জিনিষ হবে তখনি সেই অবস্থাকে বলব মুক্তি।

এখনো নিয়মের সঙ্গে আমার সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য হয়নি। এখনো চল্‌তে ফিরতে বাধে।

এখনো সকলের ভালোকে আমার ভালো বলে অনুভব করিনে। সকলের ভালোর বিরুদ্ধে আমার অনেক স্থানেই বিদ্রোহ আছে।

এই জন্যে পিতার সঙ্গে আমার সম্পূর্ণ মিলন হচ্চে না—পিতা আমার পক্ষে রুদ্র হয়ে আছেন। তাঁর শাসনকেই আমি পদে পদে অনুভব করচি তাঁর প্রসন্নতাকে নয়। পিতার মধ্যে পুত্রের সম্পূর্ণ মুক্তি হচ্চে না।

অর্থাৎ মঙ্গল এখনো আমার পক্ষে ধর্ম্ম হয়ে ওঠেনি। যার ধর্ম্ম যেটা, সেটা তার পক্ষে বন্ধন নয় সেইটেই তার আনন্দ। চোখের ধর্ম্ম দেখা,—তাই দেখাতেই চোখের আনন্দ, দেখায় বাধা পেলেই তার কষ্ট; মনের ধর্ম্ম মনন করা, মননেই তার আনন্দ, মননে বাধা পেলেই তার দুঃখ।

বিশ্বের ভালো যখন আমার ধর্ম্ম হয়ে উঠ্‌বে তখন সেইটেতেই আমার আনন্দ এবং তার বাধাতেই আমার পীড়া হবে।

মায়ের ধর্ম্ম যেমন পুত্রস্নেহ ঈশ্বরের ধর্ম্মই তেমনি মঙ্গল। সমস্ত জগৎ চরাচরের ভাল করাই তাঁর স্বভাব, তাতেই তাঁর আনন্দ।

আমাদের স্বভাবেও সেই মঙ্গল আছে—সমগ্র হিতেই নিজের হিতবোধ মানুষের একটা ধর্ম্ম;—এই ধর্ম্ম স্বার্থের বন্ধন কাটিয়ে পূর্ণ-পরিণত হয়ে উঠ্‌বার জন্যে নিয়তই মনুষ্য-সমাজে প্রয়াস পাচ্চে। আমাদের এই ধর্ম্ম অপরিণত এবং বাধাগ্রস্ত বলেই আমরা দুঃখ পাচ্চি—পূর্ণ মঙ্গলের সঙ্গে মিলনের আনন্দ ঘটে উঠ্‌চে না।

যতদিন ভিতরের থেকে এই পরিণতিলাভ না হবে, এই বাধা কেটে গিয়ে আমাদের স্বভাব নিজেকে উপলব্ধি না করবে ততদিন বাহিরের বন্ধন আমাদের মানতেই হবে। ছেলের পক্ষে যতদিন চলাফেরা স্বাভাবিক হয়ে না ওঠে, ততদিন ধাত্রী বাইরে থেকে তার হাত ধরে তাকে চালায়। তখনি তার

মুক্তি হয় যখন চলার শক্তি তার স্বাভাবিক শক্তি হয়।

অতএব নিয়মের শাসন থেকে আমরা মুক্তিলাভ করব নিয়মকে এড়িয়ে নয়, নিয়মকে আপন করে নিয়ে। আমাদের দেশে একটা শ্লোক প্রচলিত আছে "প্রাপ্তেতু ষোড়শে বর্ষে পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ," ষোলো বছর বয়স হলে পুত্রের প্রতি মিত্রের মত ব্যবহার করবে।

তার কারণ কি? তার কারণ এই, যে পর্য্যন্ত না পুত্রের শিক্ষা পরিণতি লাভ করবে, অর্থাৎ সেই সমস্ত শিক্ষা তার স্বভাবসিদ্ধ হয়ে উঠ্‌বে, ততক্ষণ তার প্রতি একটি বাইরের শাসন রাখার দরকার হয়। বাইরের শাসন যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ পুত্রের সঙ্গে পিতার অন্তরের যোগ কখনই সম্পূর্ণ হতে পারে না। যখনি সেই বাইরের শাসনের প্রয়োজন চলে যায় তখনি পিতাপুত্রের মাঝখানের আনন্দ সম্বন্ধ একেবারে অব্যাহত

হয়ে ওঠে। তখনি সমস্ত অসত্য সত্যে বিলীন হয়, অন্ধকার জ্যোতিতে উদ্‌ভাসিত হয়, মৃত্যু অমৃতে নিঃশেষিত হয়ে যায়,—তখনি পিতার প্রকাশ পুত্রের কাছে সম্পূর্ণ হয়—তখনি, যিনি রুদ্ররূপে আঘাত করেছিলেন তিনিই প্রসন্নতাদ্বারা রক্ষা করেন। ভয় তখন আনন্দে এবং শাসন তখন মুক্তিতে পরিণত হয়; সত্য তখন প্রিয়-অপ্রিয়ের দ্বন্দ্ববর্জ্জিত সৌন্দর্য্যে উজ্জ্বল হয়, মঙ্গল তখন ইচ্ছা-অনিচ্ছার দ্বিধাবর্জ্জিত প্রেমে এসে উপনীত হয়—তখনি আমাদের মুক্তি। সে মুক্তিতে কিছুই বাদ পড়ে না, সমস্ত সম্পূর্ণ হয়; বন্ধন শূন্য হয়ে যায় না, বন্ধনই অবন্ধন হয়ে ওঠে, কর্ম্ম চলে যায় না, কিন্তু কর্ম্মই আসক্তিশূন্য বিরামস্বরূপ ধারণ করে।

৩০শে চৈত্র

দশের ইচ্ছা

আমার সমস্ত জীবন একদিন তাঁকে পিতানোঽসি বলতে পারবে, আমি তাঁরই পুত্র এই কথাটা একদিন সম্পূর্ণ হয়ে উঠবে এই আকাঙ্ক্ষাটিকে উজ্জ্বল করে ধরে রাখা বড় কঠিন।

অথচ আমাদের মনে কত অত্যাকাঙ্ক্ষা আছে, কত অসাধ্য সাধনের সঙ্কল্প আছে, কিছুতেই সেগুলি নিরস্ত হতে চায় না; বাইরে থেকে যদিবা খাদ্য জোগাতে নাও পারি তবু বুকের রক্ত দিয়ে তাকে পোষণ করি।

অথচ যে আকাঙ্ক্ষা সকলের চেয়ে বড়, যা সকলের চেয়ে চরমের দিকে যায় তাকে প্রতিদিন জাগ্রত করে রাখা এত শক্ত কেন?

তার কারণ আছে। আমরা মনে করি

আকাঙ্ক্ষা জিনিষটা আমার নিজেরই মনের সামগ্রী—আমিই ইচ্ছা করচি এবং সে ইচ্ছার আরম্ভ আমারই মধ্যে।

বস্তুত তা নয়। আমার মধ্যে আমার চতুর্দ্দিক ইচ্ছা করে। আমার জারক রস আমার জঠরেরই উৎপন্ন সামগ্রী বটে কিন্তু আমার ইচ্ছা কেবল আমারই মনের উৎপন্ন পদার্থ নয়। অনেকের ইচ্ছা আমার মধ্যে ইচ্ছিত হয়ে ওঠে।

মাড়োয়ারিদিগের মধ্যে অনেক লোকেই টাকাকে ইচ্ছা করে। মাড়োয়ারির ঘরে একটি ছোট ছেলেও টাকার ইচ্ছাকে পোষণ করে। কিন্তু এই ইচ্ছা কি তার একান্ত নিজের ইচ্ছা? সে ছেলে কিছুমাত্র বিচার করে দেখেনা টাকা জিনিষটা কেন লোভনীয়। টাকার সাহায্যে যে ভাল খাবে ভাল পরবে সেকথা তার মনেও নেই। কারণ বস্তুতই টাকার লোভে সে ভাল খাওয়া পরা পরিত্যাগ

করেছে। টাকার দ্বারা সে অন্য কোনো সুখকে চাচ্চে না, অন্য সব সুখকে অবজ্ঞা করচে, সে টাকাকেই চাচ্চে।

এমনতর একটা অহেতুক চাওয়া নিশিদিন মাড়োয়ারি ছেলের মনে প্রচণ্ড হয়ে আছে তার কারণ, এই ইচ্ছা তার একলার নয়— সকলে মিলেই তাকে ইচ্ছা করাচ্চে—কোনো-মতেই তার ইচ্ছাকে থাম্‌তে দিচ্চে না।

কোনো সমাজে যদি কোন একটা নিরর্থক আচরণের বিশেষ গৌরব থাকে তবে অনেক লোককেই দেখা যাবে সেই আচারের জন্য তারা নিজের সুখসুবিধা পরিত্যাগ করে তাতেই নিযুক্ত আছে—দশজনে এইটে আকাঙ্ক্ষা করে এই হচ্চে ওর জোর—আর কোনো তাৎপর্য্য নেই।

যে দেশে অনেক লোকেই দেশকে খুব বড় জিনিষ বলে জানে সে দেশে বালকেও দেশের জন্যে প্রাণ দিতে ব্যগ্র হয়ে ওঠে।

অন্য দেশে এই দেশানুরাগের উপযোগিতা উপকারিতা সম্বন্ধে যতই আলোচনা হোক্ না তবু দেশহিতের আকাঙ্ক্ষা সত্য হয়ে মনের মধ্যে জেগে ওঠে না। কারণ দশের ইচ্ছা প্রত্যেকের ইচ্ছাকে জন্ম দিচ্চে না, পালন করচে না।

বিশ্বপিতার সঙ্গে পুত্ররূপে আমাদের মিলন হবে, রাজচক্রবর্ত্তী হওয়ার চেয়েও এটা বড় ইচ্ছা। কিন্তু এতবড় ইচ্ছাকেও অহরহ সত্য করে জাগিয়ে রাখা কঠিন হয়েছে এই জন্যেই। আমার চারিদিকের লোক এই ইচ্ছাটা আমার মধ্যে করচে না। এর চেয়ে ঢের যৎসামান্য, এমন কি, ঢের অর্থহীন ইচ্ছাকেও তারা আমার মনে সত্য করে তুলেছে এবং তাকে কোনো মতে নিবে যেতে দিচ্চে না।

এখানে আমাকে একলাই ইচ্ছা করতে হবে। এই একটি মহৎ ইচ্ছাকে আমার নিজের মধ্যেই আমার নিজের শক্তিতেই

সার্থক করে রাখ্‌তে হবে—দশ জনের কাছে আনুকূল্য প্রত্যাশা করলে হতাশ হব।

শুধু তাই নয়, শত সহস্র ক্ষুদ্র অর্থকে কৃত্রিম অর্থকে সংসারের লোক রাত্রিদিন আমার কাছে অত্যন্ত বড় করে সত্য করে রেখেছে; সেই ইচ্ছা গুলিকে শিশুকাল হতে একেবারে আমার সংস্কারগত করে রেখেছে। তারা কেবলই আমার মনকে টান্‌চে, আমার চেষ্টাকে কাড়চে; বুদ্ধিতে যদিবা বুঝি তারা তুচ্ছ এবং নিরর্থক কিন্তু দশের ইচ্ছাকে ঠেল্‌তে পারিনে।

দশের ইচ্ছা যদি কেবল বাইরে থেকে তাড়না করে তবে তাকে কাটিয়ে ওঠা যায় কিন্তু সে যখন আমারই ইচ্ছা আকার ধরে আমারই চূড়ার উপরে বসে হাল চেপে ধরে, আমি যখন জান্‌তেও পারিনে যে বাইরে থেকে সে আমার মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে তখন তার সঙ্গে লড়াই করবার ইচ্ছামাত্রও চলে যায়।

এত বড় একটা সম্মিলিত বিরুদ্ধতার প্রতিকূলে আমার একলা মনের ইচ্ছাটিকে জাগিয়ে রাখ্‌তে হবে এই হয়েছে আমার কঠিন সাধনা।

কিন্তু আশার কথা এই যে, নারায়ণকে যদি সারথী করি তবে অক্ষৌহিণী সেনাকে ভয় করতে হবে না। লড়াই একদিনে শেষ হবে না—কিন্তু শেষ হবেই—জিত হবে তার সন্দেহ নেই।

এই একলা লড়াইয়ের একটা মস্ত সুবিধা এই যে, এর মধ্যে কোনো মতেই ফাঁকি ঢোকাবার জো নেই। দশ জনের সঙ্গে ভিড়ে গিয়ে কোনো কৃত্রিমতাকে ঘটিয়ে তোলবার আশঙ্কা নেই। নিতান্ত খাঁটি হয়ে চল্‌তে হবে।

টাকা, বিদ্যা, খ্যাতি প্রভৃতির একটা আকর্ষণ এই যে সে গুলোকে নিয়ে সকলে মিলে কাড়াকাড়ি করে। অতএব আমি যদি

তার কিছু পাই তবে অন্যের চেয়ে আমার জিত হয়। এই জন্যেই সমস্ত উপার্জ্জনের মধ্যে এত ঈর্ষা ক্রোধ লোভ রয়েছে। এই জন্যে লোকে এত ফাঁকি চালায়। যার অর্থ কম সে প্রাণপণে দেখাতে চেষ্টা করে তার অর্থ বেশি, যার বিদ্যা অল্প সে সেটা যথাসাধ্য গোপন করবার চেষ্টায় ফেরে।

এই সকল জিনিষের দ্বারা মানুষ মানুষের কাছে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে চায়—সুতরাং জিনিষে যদি কম পড়ে তবে ফাঁকিতে সেটা পূরণ করবার ইচ্ছা হয়। মানুষকে ঠকানও একেবারে অসাধ্য নয়—এই জন্যে সংসারে অনেক প্রতারণা অনেক আড়ম্বর চলে—এই জন্যে ভিতরে যদি বা কিছু জমাতে পারি বাইরে তার সাজসরঞ্জাম করি অনেক বেশি।

যে সব সামগ্রী দশের কাড়াকাড়ির সামগ্রী সেই গুলির সম্বন্ধে এই ফাঁকি অলক্ষ্যে নিজের অগোচরেও এসে পড়ে—ঠাট বজায়

রাখবার চেষ্টাকে আমরা দোষের মনে করিনে, এমন কি, বাহিরের সাজের দ্বারা আমরা ভিতরের জিনিষকে পেলুম বলে নিজেকেও ভোলাই।

কিন্তু যেখানে আমার আকাঙ্ক্ষা ঈশ্বরের মধ্যেই প্রতিষ্ঠা লাভের আকাঙ্ক্ষা সেখানে যদি ফাঁকি চালাবার চেষ্টা করি তবে যে একেবারে মূলেই ফাঁকি হবে। গয়লা দশের দুধে জল মিশিয়ে ব্যবসা চালাতে পারে কিন্তু নিজের দুধে জল মিশিয়ে তার মুনফা কি হবে!

অতএব এইখানে একেবারে সম্পূর্ণ সত্য হতে হবে। যিনি সত্য স্বরূপ তাঁকে কেউ কোনোদিন ফাঁকি দিয়ে পার পাবে না। যিনি অন্তর্যামী তাঁর কাছে জাল জালিয়াতি খাটবে না। আমি তাঁর কাছে কতটা খাঁটি হলুম তা তিনিই জান্‌বেন—মানুষকে যদি জানাবার ইচ্ছা মনের মধ্যে আসে তবে কোন্ দিন

জালদলিল বানিয়ে তাঁকে শুদ্ধ মানুষের হাটে বিকিয়ে দিয়ে বসে থাক্‌ব। ঐখানে দশকে আস্‌তে দিয়ো না—নিজেকে খুব করে বাঁচাও! তুমি যে তাঁকে চাও এই আকাঙ্ক্ষাটির দ্বারা তুমি তাঁকেই লাভ করতে চেষ্টা কর, এর দ্বারা মানুষকে ভোলবার ইচ্ছা যেন তোমার মনের এক কোণেও না আসে। তোমার এই সাধনায় সবাই যদি তোমাকে পরিত্যাগ করে তাতে তোমার মঙ্গলই হবে, কারণ, ঈশ্বরের আসনে সবাইকে বসাবার প্রলোভন তোমার কেটে যাবে। ঈশ্বরকে যদি কোনোদিন পাও তবে কখনো তাঁকে একলা নিজের মধ্যে ধরে রাখ্‌তে পারবে না। কিন্তু সে একটি কঠিন সময়। দশের মধ্যে এসে পড়লেই জল মেশাবার লোভ সাম্‌লানো শক্ত হয়—মানুষ তখন মানুষকে চঞ্চল করে—তখন খাঁটি ভগবানকে চালাতে পারিনে, লুকিয়ে লুকিয়ে খানিকটা নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে বসে

থাকি। ক্রমে নিজের মিশালটাই বেড়ে উঠ্‌তে থাকে—ক্রমে সত্যের বিকারে অমঙ্গলের সৃষ্টি হয়। অতএব পিতাকে যেদিন পিতা বল্‌তে পারব সেদিন পিতাই যেন সেকথা আমার মুখ থেকে শোনেন, মানুষ যদি শুন্‌তে পায় ত যেন পাশের ঘর থেকেই শোনে।

৩১শে চৈত্র

বর্ষশেষ

যাওয়া আসায় মিলে সংসার। এই ছুটির মাঝখানে বিচ্ছেদ নেই। বিচ্ছেদ আমরা মনে মনে কল্পনা করি। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় একেবারেই এক হয়ে আছে। সর্ব্বদাই এক হয়ে আছে। সেই এক হয়ে থাকাকেই বলে জগৎসংসার।

আজ বর্ষশেষের সঙ্গে কাল বর্ষারম্ভের কোনো ছেদ নেই—একেবারে নিঃশব্দে অতি সহজে এই শেষ ঐ আরম্ভের মধ্যে প্রবেশ করচে।

কিন্তু এই শেষ এবং আরম্ভের মাঝখানে একবার থেমে দাঁড়ানো আমাদের পক্ষে দরকার। যাওয়া এবং আসাকে একবার বিচ্ছিন্ন করে জান্‌তে হবে, নইলে, এই ছুটিকে মিলিয়ে জান্‌তে পারব না।

সেই জন্যে আজ বর্ষশেষের দিনে আমরা কেবল যাওয়ার দিকেই মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়েছি। অস্তাচলকে সম্মুখে রেখে আজ আমাদের পশ্চিম মুখ করে উপাসনা। যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি—সমস্ত যাওয়াই যাঁর মধ্যে প্রবেশ করচে—দিবসের শেষ মুহূর্ত্তে যাঁর পায়ের কাছে সকলে নীরবে ভূমিষ্ঠ হয়ে নত হয়ে পড়চে, আজ সায়াহ্নে তাঁকে আমরা নমস্কার করব।

অবসানকে বিদায়কে মৃত্যুকে আজ আমরা ভক্তির সঙ্গে গভীর ভাবে জান্‌ব—তার প্রতি আমরা অবিচার করব না। তাকে তাঁরই ছায়া বলে জান্‌ব, যস্য ছায়ামৃতম্ যস্য মৃত্যুঃ।

মৃত্যু বড় সুন্দর বড় মধুর। মৃত্যুই জীবনকে মধুময় করে রেখেছে। জীবন বড় কঠিন; সে সবই চায়, সবই আঁকড়ে ধরে, তার বজ্রমুষ্টি কৃপণের মত কিছুই ছাড়তে চায় না। মৃত্যুই তার কঠিনতাকে রসময়

করেছে, তার আকর্ষণকে আলগা করেছে; মৃত্যুই তার নীরস চোখে জল এনে দেয়, তার পাষাণ স্থিতিকে বিচলিত করে।

আসক্তির মত নিষ্ঠুর শক্ত কিছুই নেই; সে নিজেকেই জানে, সে কাউকে দয়া করে না, সে কারো জন্যে কিছুমাত্র পথ ছাড়তে চায় না। এই আসক্তিই হচ্চে জীবনের ধর্ম্ম; সমস্তকেই সে নেবে বলে সকলের সঙ্গেই সে কেবল লড়াই করচে।

ত্যাগ বড় সুন্দর, বড় কোমল। সে দ্বার খুলে দেয়। সঞ্চয়কে সে কেবল এক জায়গায় স্তূপাকাররূপে উদ্ধত হয়ে উঠ্‌তে দেয় না। সে ছড়িয়ে দেয়, বিলিয়ে দেয়। মৃত্যুরই সেই ঔদার্য্য। মৃত্যুই পরিবেষণ করে, বিতরণ করে। যা এক জায়গায় বড় হয়ে উঠ্‌তে চায় তাকে সর্ব্বত্র বিস্তীর্ণ করে দেয়।

সংসারের উপরে মৃত্যু আছে বলেই আমরা ক্ষমা করতে পারি। নইলে আমাদের মনটা

কিছুতে নরম হত না। সব যায়, চলে যায়, আমরাও যাই, এই বিষাদের ছায়ায় সর্ব্বত্র একটি করুণা মাখিয়ে দিয়েছে—চারিদিকে পূরবী রাগিণীর কোমল সুরগুলি বাজিয়ে তুলে আমাদের মনকে কাঁদিয়ে তুলেছে। এই বিদায়ের সুরটি যখন কানে এসে পৌঁছয় তখন ক্ষমা খুবই সহজ হয়ে যায়—তখন বৈরাগ্য নিঃশব্দে এসে আমাদের নেবার জেদটাকে দেবার দিকে আস্তে আস্তে ফিরিয়ে দেয়।

কিছুই থাকে না এইটে যখন জানি তখন পাপকে দুঃখকে ক্ষতিকে আর একান্ত বলে জানিনে। দুর্গতি একটা ভয়ঙ্কর বিভীষিকা হয়েই উঠ্‌ত যদি জানতুম সে যেখানে আছে সেখান থেকে তার আর নড়চড় নেই। কিন্তু আমরা জানি সমস্তই সরচে এবং সেও সরচে সুতরাং তার সম্বন্ধে আমাদের হতাশ হতে হবে না। অনন্ত চলার মাঝখানে পাপ কেবল

একটা জায়গাতেই পাপ, কিন্তু সেখান থেকে সে এগচ্চে। আমরা সব সময়ে দেখ্‌তে পাইনে কিন্তু সে চল্‌চে—ঐখানেই তার পথের শেষ নয়—সে পরিবর্ত্তনের মুখে, সংশোধনের মুখেই রয়েছে। পাপীর মধ্যে পাপ যদি স্থির হয়েই থাকৃত তাহলে সেই স্থিরত্বের উপর রুদ্রের অসীম শাসন দণ্ড ভয়ানক ভার হয়ে তাকে একেবারে বিলুপ্ত করে দিত। কিন্তু বিধাতার দণ্ড ত তাকে এক জায়গায় চেপে রাখ্‌চে না, সেই দণ্ড তাকে তাড়না করে চালিয়ে নিয়ে যাচ্চে। এই চালানোই তাঁর ক্ষমা। তাঁর মৃত্যু কেবলি মার্জ্জনা করচে, কেবলি ক্ষমার অভিমুখে বহন করচে।

আজ বর্ষশেষ আমাদের জীবনকে কি তাঁর সেই ক্ষমার দ্বারে এনে উপনীত করবে না? যার উপরে মরণের শিলমোহর দেওয়া আছে, যা যাবার জিনিষ তাকে কি আজো আমরা যেতে দেব না! বছর ভরে যে সব পাপের

আবর্জ্জনা সঞ্চয় করেছি, আজ বৎসরকে বিদায় দেবার সময় কি তার কিছুই বিদায় দিতে পারব না? ক্ষমা করে ক্ষমা নিয়ে নির্ম্মল হয়ে নব বৎসরে প্রবেশ করতে পাব না?

আজ আমার মুষ্টি শিথিল হোক! কেবল কাড়ব এবং কেবল মারব এই করে কোনো সুখ কোনো সার্থকতা পাইনি। যিনি সমস্ত গ্রহণ করেন আজ তাঁর সম্মুখে এসে, ছাড়ব এবং মরব এই কথাটা আমার মন বলুক! আজ তাঁর মধ্যে সম্পূর্ণ ছাড়্‌তে সম্পূর্ণ মরতে এক মুহূর্ত্তে পারব না; তবু ঐ দিকেই মন নত হোক্—নিজেকে দেবার দিকেই তার অঞ্জলি প্রসারিত করুক্—সূর্য্যাস্তের সুরেই বাঁশি বাজ্‌তে থাক্, মৃত্যুর মোহন রাগিণীতেই প্রাণ কেঁদে উঠুক্—নববর্ষের ভার গ্রহণের পূর্ব্বে আজ সন্ধ্যাবেলায় সেই সর্ব্বভার-মোচনের সমুদ্রতটে সকল বোঝাই নামিয়ে দিয়ে আত্মসমর্পণের মধ্যে অবগাহন করি—নিস্তরঙ্গ

নীল জলরাশির মধ্যে শীতল হই, বৎসরের অবসানকে অন্তরের মধ্যে পূর্ণভাবে গ্রহণ করে স্তব্ধ হই শান্ত হই, পবিত্র হই।

৩১শে চৈত্র

নববর্ষদিনে যাহা বলা হইয়াছিল তাহা লিপিবদ্ধ করিবার সুযোগ ঘটে নাই।

অনন্তের ইচ্ছা

আমার শরীরের মধ্যে কতকগুলি ইচ্ছা আছে যা আমার শরীরের গোচর। যেমন আমার খেতে ইচ্ছা করে, স্নান করতে ইচ্ছা করে, শীতের সময় গরম হতে ইচ্ছা করে।

কিন্তু সমস্ত শরীরের মধ্যে একটি ইচ্ছা আছে যা আমার অগোচরেই আছে। সেটি হচ্চে স্বাস্থ্যের ইচ্ছা। সে আমাকে খবর না জানিয়েই রোগে এবং অরোগে নিয়ত কাজ করচে। সে, ব্যাধির সময় কত রকম প্রতিকারের আশ্চর্য্য ব্যবস্থা করচে তা আমরা জানিইনে এবং অরোগের সময় সমস্ত শরীরের মধ্যে বিচিত্র ক্রিয়ার সামঞ্জস্য স্থাপনার জন্যে তার কৌশলের অন্ত নেই—তারও কোনো খবর সে আমাদের জানায় না। এই স্বাস্থ্যের ইচ্ছাটি শরীরের মূলে আমাদের চেতনার

অগোচরে রাত্রিদিন নিদ্রায় জাগরণে অবিশ্রাম বিরাজ করচে।

শরীর সম্বন্ধে যে ব্যক্তি জ্ঞানী তিনি এই-টিকেই জানেন। তিনি জানেন আমাদের মধ্যে একটি স্বাস্থ্যতত্ত্ব আছে। শরীরের এই মূল অব্যক্ত ইচ্ছাটিকে যিনি জেনেছেন তিনি শরীরগত সমস্ত ব্যক্ত ইচ্ছাকে এর অনুগত করে তোলেন। ব্যক্ত ইচ্ছা যখন খাব বলে আবদার করচে তখন তাকে তিনি এই অব্যক্ত স্বাস্থ্যের ইচ্ছারই শাসনে নিয়মিত করবার চেষ্টা করেন। শরীর সম্বন্ধে এইটেই হচ্চে সাধনা।

পাঁচজনের সঙ্গে মিলে আমরা যে একটা সামাজিক শরীর রচনা করে আছি, তার মধ্যেও ব্যক্ত এবং অব্যক্ত ইচ্ছা আছে। সমাজের প্রত্যেকের নিজের স্বার্থ সুবিধা সুখ ও স্বাধীনতার জন্যে যে ইচ্ছা এইটেই তার ব্যক্ত ইচ্ছা। সকলেই বেশি পেতে চাচ্চে,

সকলেই জিৎতে চাচ্চে, যত কম মূল্য দিয়ে যত বেশি পরিমাণ আদায় করতে পারে এই সকলের ইচ্ছা। এই ইচ্ছার সংঘাতে কত ফাঁকি কত যুদ্ধ কত দলাদলি চল্‌চে তার আর সীমা নেই।

কিন্তু এরই মধ্যে একটি অব্যক্ত ইচ্ছা ধ্রুব হয়ে আছে—তাকে প্রত্যক্ষ দেখা যাচ্চে না—কিন্তু সে আছেই, না থাক্‌লে কোনোমতেই সমাজ রক্ষা পেত না—সে হচ্চে মঙ্গলের ইচ্ছা। অর্থাৎ সমস্ত সমাজের সুখ হোক ভাল হোক্‌ এই ইচ্ছা প্রত্যেকের মধ্যে নিগূঢ়ভাবেই আছে—এই থাকার উপরেই সমাজ বেঁধে উঠেছে, কোনো প্রত্যক্ষ সুবিধার উপরে নয়।

সমাজ সম্বন্ধে যাঁরা জ্ঞানী তাঁরা এইটেই জেনেছেন। তাঁরা সমুদয় সুখ সুবিধা স্বাধীনতার ব্যক্ত ইচ্ছাকে এই গভীরতর অব্যক্ত মঙ্গল ইচ্ছার অনুগত করতে চেষ্টা

করেন। তাঁরা এই নিগূঢ় নিত্য ইচ্ছার কাছে সমস্ত অনিত্য ইচ্ছাকে ত্যাগ করতে পারেন।

আমাদের আত্মার মধ্যেও ব্যক্ত এবং অব্যক্ত ইচ্ছা আছে। আত্মা আপনাকে নানা দিকে বড় বলে অনুভব করতে চায়। সে ধনে বড় বিদ্যায় বড় খ্যাতিতে বড় হয়ে নিজেকে বড় জান্‌তে চায়। এর জন্যে কাড়াকাড়ি মারামারির অন্ত নেই।

কিন্তু তার মধ্যে প্রতিনিয়ত একটি অব্যক্ত ইচ্ছা রয়েইচে। সকলের বড়, যিনি অনন্ত অখণ্ড এক, সেই ব্রহ্মের মধ্যে মিলনেই নিজেকে উপলব্ধি করবার ইচ্ছা তার মধ্যে নিগূঢ়রূপে ধ্রুবরূপে রয়েছে। এই অব্যক্ত ইচ্ছাই তার সকলের চেয়ে বড় ইচ্ছা।

তিনিই আত্মবিৎ যিনি এই কথাটি জানেন। তিনি আত্মার সমস্ত ব্যক্ত ইচ্ছাকে সেই নিগূঢ় এক ইচ্ছার অধীন করেন।

শরীরের নানা ইচ্ছা ঐক্যলাভ করেছে

একটি একের মধ্যে সেইটি হচ্চে স্বাস্থ্যের ইচ্ছা, এই গভীর ইচ্ছাটি শরীরের সমস্ত বর্ত্তমান ইচ্ছাকে অতিক্রম করে অনাগতের মধ্যে চলে গেছে—শরীরের যে ভবিষ্যৎটি এখন নেই সেই ভবিষ্যৎকেও সে অধিকার করে রয়েছে।

সমাজশরীরেও নানা ইচ্ছা এক অন্তরতম গোপন ইচ্ছার মধ্যে ঐক্যলাভ করেছে; সে ঐ মঙ্গলইচ্ছা। সে ইচ্ছাও বর্ত্তমান সুখদুঃখের সীমা ছাড়িয়ে ভবিষ্যতের অভিমুখে চলে গেছে।

আত্মার অন্তরতম ইচ্ছা দেশে কালে কোথাও বদ্ধ নয়। তার যে সকল ইচ্ছা কেবল পৃথিবীতেই সার্থক হতে পারে সেই সকল ইচ্ছার মধ্যেই তার সমাপ্তি নয়—অনন্তের সঙ্গে মিলনের আকাঙ্ক্ষাই তার জ্ঞান প্রেম কর্ম্মকে কেবলি আকর্ষণ করচে;—সে যেখানে গিয়ে পৌঁছচ্চে সেখানে গিয়ে থামতে পারচে না—কেবলি ছাড়িয়ে নিয়ে যাবার ইচ্ছা তার সমস্ত ইচ্ছার ভিতরে নিরন্তর জাগ্রত হয়ে রয়েছে।

শরীরের মধ্যে এই স্বাস্থ্যের শান্তি, সমাজের মধ্যে মঙ্গল, এবং আত্মার মধ্যে অদ্বিতীয়ের প্রেম, ইচ্ছারূপে বিরাজ করচে। এই ইচ্ছা অনন্তের ইচ্ছা, ব্রহ্মের ইচ্ছা। তাঁর এই ইচ্ছার সঙ্গে আমাদের সচেতন ইচ্ছাকে সঙ্গত করে দেওয়াই আমাদের মুক্তি। এই ইচ্ছার সঙ্গে অসামঞ্জস্যই আমাদের বন্ধন, আমাদের দুঃখ। ব্রহ্মের যে ইচ্ছা আমাদের মধ্যে আছে সে আমাদের দেশকালের বাইরের দিকে নিয়ে যাবার ইচ্ছা—কোনো বর্ত্তমানের বিশেষ স্বার্থ বা সুখের মধ্যে আবদ্ধ করবার ইচ্ছা নয়—সে ইচ্ছা কিনা তাঁর প্রেম এইজন্যে সে তাঁরই দিকে আমাদের টান্‌চে। এই অনন্ত প্রেম যা আমাদের মধ্যেই আছে, তার সঙ্গে আমাদের প্রেমকে যোগ করে দিয়ে আমাদের আনন্দকে বাধামুক্ত করে দেওয়াই আমাদের সাধনা। কি শরীরে, কি সমাজে, কি আত্মায়, সর্ব্বত্রই আমরা এই যে দুটি ইচ্ছার

ধারাকে দেখ্‌তে পাচ্চি, একটি আমাদের গোচর অথচ চিরপরিবর্ত্তনশীল—আর একটি আমাদের অগোচর অথচ চিরন্তন, একটি কেবল বর্ত্তমানের প্রতিই আকৃষ্ট, আর একটি অনাগতের দিকে আকর্ষণকারী, একটি কেবল ব্যক্তিবিশেষের মধ্যেই বদ্ধ, আর একটি নিখিলের সঙ্গে যোগযুক্ত—এই দুটি ইচ্ছার গতি নিরীক্ষণ কর, এর তাৎপর্য্য গ্রহণ কর। এদের উভয়ের মধ্যে মিলিত হবার যে একটা তত্ত্ব বিরোধের দ্বারাই নিজেকে ব্যক্ত করচে সেইটি উপলব্ধি করে এই মিলনের জন্যই সমস্ত জীবন প্রতিদিনই আপনাকে প্রস্তুত কর।

৩রা বৈশাখ

পাওয়া ও না-পাওয়া

সেই পাওয়াতেই মানুষের মন আনন্দিত যে পাওয়ার সঙ্গে না-পাওয়া জড়িত হয়ে আছে।

যে সুখ কেবলমাত্র পাওয়ার দ্বারাই আমাদের উন্মত্ত করে তোলে না—অনেকখানি না-পাওয়ার মধ্যে যার স্থিতি আছে বলেই যার ওজন ঠিক আছে—সেই জন্যেই যাকে আমরা গভীর সুখ বলি—অর্থাৎ, যে সুখের সকল অংশই একেবারে সুস্পষ্ট সুব্যক্ত নয়, যার এক অংশ নিগূঢ়তার মধ্যে অগোচর, যা প্রকাশের মধ্যেই নিঃশেষিত নয়, তাকেই আমরা উচ্চ শ্রেণীর সুখ বলি।

পেটভরে আহার করলে পর আহার করবার সুখটা সম্পূর্ণ পাওয়া যায়;—দর্শনে স্পর্শনে ঘ্রাণে স্বাদে সর্ব্বপ্রকারে তাকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করা হয়। সে সুখের প্রতি যতই

লোভ থাকুক্ মানুষ তাকে আনন্দের কোঠায় ফেলে না।

কিন্তু যে সৌন্দর্য্যবোধকে আমরা কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়বোধের দ্বারা সেরে ফেল্‌তে পারিনে—যা বীণার অনুরণনের মত চেতনার মধ্যে স্পন্দিত হতে থাকে, যা সমাপ্ত হতেই চায় না, সে আনন্দকে আমরা আহারের আনন্দের সঙ্গে এক শ্রেণীতে গণ্যই করিনে। কেবলমাত্র পাওয়া তাকে অপমানিত করে না, না পাওয়া তাকে গৌরব দান করে।

আমরা জগতে পাওয়ার মত পাওয়া তাকেই বলি যে পাওয়ার মধ্যে অনির্ব্বচনীয়তা আছে। যে জ্ঞান কেবলমাত্র একটি খবর, তার মূল্য অতি অল্প—কেন না, সেটা একটা সঙ্কীর্ণ জানার মধ্যেই ফুরিয়ে যায়। কিন্তু যে জ্ঞান তথ্য নয়, তত্ত্ব, অর্থাৎ যাকে কেবল একটি ঘটনার মধ্যে নিঃশেষ করা যায় না—যা অসংখ্য অতীত ঘটনার মধ্যেও আছে এবং যা

অসংখ্য ভাবী ঘটনার মধ্যেও আপনাকে প্রকাশ করবে—যা কেবল ঘটনাবিশেষের মধ্যে ব্যক্ত বটে কিন্তু অনন্তের মধ্যে অব্যক্ত-রূপে বিরাজমান সেই জ্ঞানেই আমাদের আনন্দ; কেবলমাত্র বিচ্ছিন্ন তুচ্ছ খবরে নিতান্ত জড়বুদ্ধি অলস লোকের বিলাস।

ক্ষণিক আমোদ বা ক্ষণিক প্রয়োজনে আমরা অনেক লোকের সঙ্গে মিলি—আমাদের কাছে তারা সেইটুকুর মধ্যেই নিঃশেষিত। কিন্তু যে আমার প্রিয় কোনো এক সময়ের আলাপে আমোদে কোনো এক সময়ের প্রয়োজনে তার শেষ পাইনে। তার সঙ্গে যে সময়ে যে আলাপে যে কর্ম্মে নিযুক্ত আছি, সে সময়কে সেই আলাপকে সেই কর্ম্মকে বহুদূরে ছাড়িয়ে সে রয়েছে। কোনো বিশেষ দেশে বিশেষ কালে বিশেষ ঘটনায় আমরা তাকে সমাপ্ত করলুম বলে মনেই করতে পারিনে—সে আমার কাছে প্রাপ্ত অথচ

অপ্রাপ্ত—এই অপ্রাপ্তি তাকে আমার কাছে এমন আনন্দময় করে রেখেছে।

এর থেকে বোঝা যায় আমাদের আত্মা যে পেতেই চাচ্চে তা নয় সে না পেতেও চায়। এই জন্যেই সংসারের সমস্ত দৃশ্যস্পৃশ্যের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সে বল্‌চে কেবলি পেয়ে পেয়ে আমি শ্রান্ত হয়ে গেলুম—আমার না-পাওয়ার ধন কোথায়? সেই চিরদিনের না-পাওয়াকে পেলে যে আমি বাঁচি;—

যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন—

বাক্য মন যাঁকে না পেয়ে ফিরে আসে সেই আমার না-পাওয়া ব্রহ্মের আনন্দে আমি সমস্ত ক্ষুদ্র ভয় হতে যে রক্ষা পেতে পারি।

এই জন্যেই উপনিষৎ বলেছেন "অবিজ্ঞাতম্ বিজানতাং বিজ্ঞাতম্ অবিজানতাম্"—যিনি বলেন আমি তাঁকে জানিনি তিনিই জানেন, যিনি বলেন আমি জেনেছি তিনি জানেন না।

আমি তাঁকে জান্‌তে পারলুম না এ কথাটা জানবার অপেক্ষা আছে। পাখী যেমন করে জানে আমি আকাশ পার হতে পারলুম না তেমনি করে জানা চাই—পাখী আকাশকে জানে বলেই সে জানে যে আকাশ পার হওয়া গেল না। আকাশ পার হওয়া গেল না জানে বলেই তার আনন্দ—এই জন্যেই সে আকাশে উড়ে বেড়ায়—কোনো প্রাপ্তি নয়, কোনো সমাপ্তি নয়, কোনো প্রয়োজন নয়, কিন্তু উড়েই তার আনন্দ।

পাখী আকাশকে জানে বলেই সে জানে আমি আকাশকে শেষ করে জানলুম না এবং এই জেনে না-জানাতেই তার আনন্দ—ব্রহ্মকে জানার কথাতেও এই কথাটাই খাটে। সেই জন্যেই উপনিষৎ বলেন:—"নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ"—আমি যে ব্রহ্মকে বেশ জেনেছি এও নয় আমি যে একেবারে জানিনে এও নয়।

কেউ কেউ বলেন আমরা ব্রহ্মকে একেবারেই জান্‌তে চাই—যেমন করে এই সমস্ত জিনিষপত্র জানি নইলে আমার কিছুই হ'ল না।

আমি বলচি আমরা তা চাইনে। যদি চাইতুম তাহলে সংসারই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। এখানে জিনিষপত্রের অন্ত কোথায়? এর উপরে আবার কেন? নীড়ের পাখী যেমন আকাশকে চায় তেমনি আমরা এমন কিছুকে চাই যাকে পাওয়া যায় না।

আমার মনে আছে, যাঁরা ব্রহ্মকে চান তাঁদের প্রতি বিদ্রূপ প্রকাশ করে একজন পণ্ডিত অনেকদিন হ'ল বলেছিলেন—একদল গাঁজাখোর রাত্রে গাঁজা খাবার সভা করেছিল। টীকা ধরাবার আগুন ফুরিয়ে যাওয়াতে তারা সঙ্কটে পড়েছিল। তখন রক্তবর্ণ হয়ে চাঁদ আকাশে উঠ্‌ছিল। একজন বল্লে, ঐ যে, ঐ আলোতে টীকা ধরাব। ব'লে টীকা নিয়ে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে চাঁদের অভিমুখে

বাড়িয়ে ধ'রলে। টীকা ধ'রল না। তখন আর একজন বল্লে, দূর চাঁদ বুঝি অত কাছে! দে আমাকে দে! বলে সে আরো কিছু দূরে গিয়ে টীকা বাড়িয়ে ধরলে—এমনি করে সমস্ত গাঁজাখোরের শক্তি পরাস্ত হল—টীকা ধ'রলনা।

এই গল্পের ভাবখানা হচ্চে এই, যে, যে ব্রহ্মের সীমা পাওয়া যায় না তাঁর সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা এই রকম বিড়ম্বনা।

এর থেকে দেখা যাচ্চে কারো কারো মতে সাংসারিক প্রার্থনা ছাড়া আমাদের মনে আর কোনো প্রার্থনা নেই। আমরা কেবল প্রয়োজন সিদ্ধিই চাই—টীকেয় আমাদের আগুন ধরাতে হবে।

এ কথাটা যে কত অমূলক তা ঐ চাঁদের কথা ভাব্‌লেই বোঝা যাবে। আমরা দেশলাইকে যে ভাবে চাই চাঁদকে সে ভাবে চাইনে—চাঁদকে চাঁদ বলেই চাই—চাঁদ আমাদের বিশেষ কোনো সঙ্কীর্ণ প্রয়োজনের

অতীত বলেই তাকে চাই। সেই চির-অতৃপ্ত অসমাপ্ত পাওয়ার চাওয়াটাই সব চেয়ে বড় চাওয়া। সেই জন্যেই পূর্ণচন্দ্র আকাশে উঠ্‌লেই নদীতে নৌকায়, ঘাটে, গ্রামে, পথে, নগরের হর্ম্মতলে গাছের নীড়ে চারিদিক থেকে গান জেগে ওঠে—কারো টীকেয় আগুন ধরে না বলে কোথাও কোনো ক্ষোভ থাকে না।

ব্রহ্ম ত তাল বেতাল নন যে তাঁকে আমরা বশ করে নিয়ে প্রয়োজন সিদ্ধি করব। কেবল প্রয়োজন সিদ্ধিতেই পাওয়ার দরকার—আনন্দের পাওয়াতে ঠিক তার উল্টো। তাতে না-পাওয়াটাই হচ্চে সকলের চেয়ে বড় জিনিষ। যে জিনিষ আমরা পাই তাতে আমাদের যে সুখ সে অহঙ্কারের সুখ। আমার আয়ত্তের জিনিষ আমার ভৃত্য আমার অধীন—আমি তার চেয়ে বড়।

কিন্তু এই সুখই মানুষের সব চেয়ে বড়

সুখ নয়। আমার চেয়ে যে বড় তার কাছে আত্মসমর্পণ করার সুখই হচ্চে আনন্দ। আমার যিনি অতীত আমি তাঁরই, এইটি জানাতেই অভয়, এইটি অনুভব করাতেই আনন্দ। যেখানে ভূমানন্দ সেখানে আমি বলি, আমি আর পারলুম না, আমি হাল ছেড়ে দিলুম, আমি গেলুম! গেল আমার অহঙ্কার, গেল আমার শক্তির ঔদ্ধত্য। এই না পেরে ওঠার মধ্যে এই না পাওয়ার মধ্যে নিজেকে একান্ত ছেড়ে দেওয়াই মুক্তি।

মানুষ ত সমাপ্ত নয়—সে ত হয়ে বয়ে যায়নি—সে যেটুকু হয়েছে সে ত অতি অল্পই। তার না-হওয়াই যে অনন্ত। মানুষ যখন আপনার এই হওয়া-রূপী জীবের বর্ত্তমান প্রয়োজন সাধন করতে চায় তখন প্রয়োজনের সামগ্রীকে নিজের অভাবের সঙ্গে একেবারে সম্পূর্ণ করে চারিদিকে মিলিয়ে নিতে হয়—তার বর্ত্তমানটি একেবারে সম্পূর্ণ বর্ত্তমানকেই

চাচ্চে। কিন্তু সে ত কেবলি বর্ত্তমান নয়—সেত কেবলি হওয়া-রূপী নয়, তার না-হওয়ারূপী অনন্ত যদি কিছুই না পায় তবে তার আনন্দ নেই। পাওয়ার সঙ্গে অনন্ত না-পাওয়া তার সেই অনন্ত না-হওয়াকে আশ্রয় দিচ্চে খাদ্য দিচ্চে। এই জন্যেই মানুষ কেবলি বলে অনেক দেখ্‌লুম, অনেক শুন্‌লুম, অনেক বুঝ্‌লুম—কিন্তু আমার না-দেখার ধন, না শোনার ধন, না বোঝার ধন কোথায়? যা অনাদি বলেই অনন্ত, যা হয় না বলেই যায় না—যাকে পাইনে বলেই হারাইনে, যা আমাকে পেয়েছে বলেই আমি আছি, সেই অশেষের মধ্যে নিজেকে নিঃশেষ করবার জন্যেই আত্মা কাঁদ্‌চে। সেই অশেষকে সশেষ করতে চায় এমন ভয়ঙ্কর নির্ব্বোধ সে নয়। যাকে আশ্রয় করবে তাকে আশ্রয় দিতে চায় এমন সমূলে আত্মঘাতী নয়।

৪ঠা বৈশাখ

হওয়া

পাওয়া মানেই আংশিকভাবে পাওয়া। প্রয়োজনের জন্যে আমরা যাকে পাই তাকে ত কেবল প্রয়োজনের মতই পাই তার বেশি ত পাইনে। অন্ন কেবল খাওয়ার সঙ্গে মেলে, বস্ত্র কেবল পরার সঙ্গেই মেলে, বাড়ি কেবল বাসের সঙ্গে মেলে। এদের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ ঐ সকল ক্ষুদ্র প্রয়োজনের সীমাতে এসে ঠেকে, সেটাকে আর লঙ্ঘন করা যায় না।

এই রকম বিশেষ প্রয়োজনের সঙ্কীর্ণ পাওয়াকেই আমরা লাভ বলি। সেই জন্যে ঈশ্বরকে লাভের কথা যখন ওঠে তখনও ভাষা এবং অভ্যাসের টানে ঐ রকম লাভের কথাই মনে উদয় হয়। সে যেন কোনো বিশেষ স্থানে কোনো বিশেষ কালে লাভ—তাঁকে

দর্শন মানে কোনো বিশেষ মূর্ত্তিতে কোনো বিশেষ মন্দিরে বা বিশেষ কল্পনায় দর্শন।

কিন্তু পাওয়া বল্‌তে যদি আমরা এই বুঝি তবে ঈশ্বরকে পাওয়া হতেই পারে না। আমরা যা কিছুকে পেলুম বলে মনে করি সে আমাদের ঈশ্বর নয়—তিনি আমাদের পাওয়ার সম্পূর্ণ অতীত—তিনি আমাদের বিষয় সম্পত্তি নন্‌!

ও জায়গায় আমাদের কেবল হওয়া—পাওয়া নয়। তাঁকে আমরা পাব না, তাঁর মধ্যে আমরা হব। আমার সমস্ত শরীর মন হৃদয় নিয়ে আমি কেবলি হয়ে উঠ্‌তে থাকব। ছাড়তে ছাড়তে বাড়তে বাড়তে মরতে মরতে বাঁচতে বাঁচতে আমি কেবলি হব। পাওয়াটা কেবল এক অংশে পাওয়া, হওয়াটা যে একেবারে সমগ্রভাবে হওয়া—সে ত লাভ নয় সে বিকাশ।

ভীরু লোকে বল্‌বে, বল কি! তুমি ব্রহ্ম হবে! এমন কথা তুমি মুখে আন কি করে!

হাঁ, আমি ব্রহ্মই হব। এ কথা ছাড়া অন্যকথা আমি মুখে আন্‌তে পারিনে—আমি অসঙ্কোচেই বল্‌ব, আমি ব্রহ্ম হব। কিন্তু আমি ব্রহ্মকে পাব এতবড় স্পর্দ্ধার কথা বল্‌তে পারিনে।

তবে কি ব্রহ্মেতে আমাতে তফাৎ নেই? মস্ত তফাৎ আছে। তিনি ব্রহ্ম হয়েই আছেন, আমাকে ব্রহ্ম হতে হচ্চে। তিনি হয়ে রয়েছেন, আমি হয়ে উঠ্‌ছি, আমাদের দুজনের মধ্যে এই লীলা চল্‌চে। হয়ে থাকার সঙ্গে হয়ে ওঠার নিয়ত মিলনেই আনন্দ।

নদী কেবলি বল্‌চে আমি সমুদ্র হব। সে তার স্পর্দ্ধা নয়—সে যে সত্য কথা, সুতরাং সেই তার বিনয়। তাই সে সমুদ্রের সঙ্গে মিলিত হয়ে ক্রমাগতই সমুদ্র হয়ে যাচ্চে—তার আর সমুদ্র হওয়া শেষ হল না।

বস্তুত চরমে সমুদ্র হতে থাকা ছাড়া তার আর গতিই নেই। তার দুই দীর্ঘ উপকূলে কত ক্ষেত কত সহর কত গ্রাম কত বন আছে

তার ঠিক নেই—নদী তাদের তুষ্ট করতে পারে পুষ্ট করতে পারে, কিন্তু তাদের সঙ্গে মিলে যেতে পারেনা। এই সমস্ত সহর গ্রাম বনের সঙ্গে তার কেবল আংশিক সম্পর্ক। নদী হাজার ইচ্ছা করলেও সহর গ্রাম বন হয়ে উঠ্‌তে পারে না।

সে কেবল সমুদ্রই হতে পারে। তার ছোট সচল জল সেই বড় অচল জলের একই জাত। এই জন্যে তার সমস্ত উপকূল পার হয়ে বিশ্বের মধ্যে সে কেবল ঐ বড় জলের সঙ্গেই এক হতে পারে।

সে সমুদ্র হতে পারে কিন্তু সে সমুদ্রকে পেতে পারে না। সমুদ্রকে সংগ্রহ করে এনে নিজের কোনো বিশেষ প্রয়োজনে তাকে কোনো বিশেষ গুহা গহ্বরে লুকিয়ে রাখ্‌তে পারে না—যদি কোনো ছোট জলকে দেখিয়ে সে মূঢ়ের মত বলে, হাঁ সমুদ্রকে এইখানে আমি নিজের সম্পত্তি করে রেখেছি

তাকে উত্তর দেব, ও তোমার সম্পত্তি হতে পারে কিন্তু ও তোমার সমুদ্র নয়। তোমার চিরন্তন জলধারা এই জলাটাকে চায় না, সে সমুদ্রকেই চায়। কেন না সে সমুদ্র হতে চাচ্চে সে সমুদ্রকে পেতে চাচ্চে না।

আমরাও কেবল ব্রহ্মই হতে পারি আর কিছুই হতে পারিনে। আর কোনো হওয়াতে ত আমরা সম্পূর্ণ হইনে। সমস্তই আমরা পেরিয়ে যাই ; পেরতে পারিনে ব্রহ্মকে। ছোট সেখানে বড় হয়। কিন্তু তার সেই বড় হওয়া শেষ হয়না —এই তার আনন্দ।

আমরা এই আনন্দেরই সাধনা করব। আমরা ব্রহ্মে মিলিত হয়ে অহরহ কেবল ব্রহ্মই হতে থাক্‌ব। যেখানে বাধা পাব সেখানে, হয় ভেঙে নয় এড়িয়ে যাব। অহঙ্কার, স্বার্থ এবং জড়তা যেখানে নিষ্ফল বালির স্তূপ হয়ে পথ রোধ করে দাঁড়াবে সেখানে প্রতিমুহূর্ত্তে তাকে ক্ষয় করে ফেলব।

সকাল বেলায় এইখানে বসে যে একটু-খানি উপাসনা করি এই দেশকালবদ্ধ আংশিক জিনিষটিকে আমরা যেন সিদ্ধি বলে ভ্রম না করি। একটু রস, একটু ভাব, একটু চিন্তাই ব্রহ্ম নয়। এইটুকুমাত্রকে নিয়ে কোনদিন জম্‌চে কোনোদিন জম্‌চেনা বলে খুঁৎ খুঁৎ কোরো না—এই সময় এবং এই অনুষ্ঠানটিকে একটি অভ্যস্ত আরামে পরিণত করে সেটাকে একটা পরমার্থ বলে কল্পনা কোরোনা। সমস্ত দিন সমস্ত চিন্তায় সমস্ত কাজে একেবারে সমগ্র নিজেকে ব্রহ্মের অভিমুখে চালনা কর—উল্টোদিকে নয়, নিজের দিকে নয় —কেবলই সেই ভূমার দিকে, শ্রেয়ের দিকে, অমৃতের দিকে। সমুদ্রে নদীর মত তাঁর সঙ্গে মিলিত হও—তাহলে তোমার সমস্ত সত্তার ধারা কেবলি তিনিময় হতে থাকবে, কেবলি তুমি ব্রহ্ম হয়ে উঠ্‌বে। তাহলে তুমি তোমার সমস্ত জীবন দিয়ে সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে জান্‌তে

পারবে ব্রহ্মই তোমার পরমা গতি, পরমা সম্পৎ, পরম আশ্রয়, পরম আনন্দ, কেননা তাঁতেই তোমার পরম হওয়া।

৬ই বৈশাখ

মুক্তি

এই যে সকাল বেলাটি প্রতিদিন আমাদের কাছে প্রকাশিত হয় এতে আমাদের আনন্দ অল্পই। এই সকাল আমাদের অভ্যাসের দ্বারা জীর্ণ হয়ে গেছে।

অভ্যাস আমাদের নিজের মনের তুচ্ছতা দ্বারা সকল মহৎ জিনিষকেই তুচ্ছ করে দেয়। সে নাকি নিজে বদ্ধ এই জন্যে সে সমস্ত জিনিষকেই বদ্ধ করে দেয়।

আমরা যখন বিদেশে বেড়াতে যাই তখন কোনো নূতন পৃথিবীকে দেখ্‌তে যাইনে। এই মাটি এই জল এই আকাশকেই আমাদের অভ্যাস থেকে বিমুক্ত করে দেখ্‌তে যাই। আবরণটাকে ঘুচিয়ে এই পৃথিবীর উপরে চোখ মেল্‌লেই এই চিরদিনের পৃথিবীতেই

সেই অভাবনীয়কে দেখ্‌তে পাই যিনি কোনোদিন পুরাতন নন। তখনই আনন্দ পাই।

যে আমাদের প্রিয়, অভ্যাস তাকে সহজে বেষ্টন করতে পারে না। এইজন্যই প্রিয়জন চিরদিনই অভাবনীয়কে অনন্তকে আমাদের কাছে প্রকাশ করতে পারে। তাকে যে আমরা দেখি সেই দেখাতেই আমাদের দেখা শেষ হয় না—সে আমাদের দেখা শোনা আমাদের সমস্ত বোধকেই ছাড়িয়ে বাকি থাকে। এইজন্যেই তাতে আমাদের আনন্দ।

তাই উপনিষৎ, "আনন্দরূপমমৃতং" ঈশ্বরের আনন্দরূপকে অমৃত বলেছেন। আমাদের কাছে যা মরে যায় যা ফুরিয়ে যায় তাতে আমাদের আনন্দ নেই—যেখানে আমরা সীমার মধ্যে অসীমকে দেখি অমৃতকে দেখি সেইখানেই আমাদের আনন্দ।

এই অসীমই সত্য—তাঁকে দেখাই সত্যকে

দেখা। যেখানে তা না দেখ্‌বে সেইখানেই বুঝতে হবে আমাদের নিজের জড়তা মূঢ়তা অভ্যাস ও সংস্কারের দ্বারা আমরা সত্যকে অবরুদ্ধ করেছি, সেইজন্যে তাতে আমরা আনন্দ পাচ্চিনে।

বৈজ্ঞানিক বল, দার্শনিক বল, কবি বল, তাঁদের কাজই মানুষের এই সমস্ত মূঢ়তা ও অভ্যাসের আবরণ মোচন করে এই জগতের মধ্যে সত্যের অনন্তরূপকে দেখানো—যা-কিছু দেখ্‌ছি এ'কেই সত্য করে দেখানো—নূতন কিছু তৈরি করা নয় কল্পনা করা নয়। এই সত্যকে মুক্ত করে দেখানোর মানেই হচ্চে মানুষের আনন্দের অধিকার বাড়িয়ে দেওয়া।

যেমন ঘর ছেড়ে দিয়ে কোনো দূরদেশে যাওয়াকে অন্ধকারমুক্তি বলে না, ঘরের দরজাকে খুলে দেওয়াই বলে অন্ধকার মোচন, তেমনি জগৎসংসারকে ত্যাগ করাই মুক্তি নয়; পাপ স্বার্থ, অহঙ্কার, জড়তা মূঢ়তা ও

সংস্কারের বন্ধন কাটিয়ে, যা দেখছি এ'কেই সত্য করে দেখা, যা করচি একেই সত্য করে করা, যার মধ্যে আছি এরই মধ্যে সত্য করে থাকাই মুক্তি।

যদি এই কথাই সত্য হয় যে ব্রহ্ম কেবল আপনার অব্যক্ত স্বরূপেই আনন্দিত তাহলে তাঁর সেই অব্যক্ত স্বরূপের মধ্যে বিলীন না হলে নিরানন্দের হাত থেকে আমাদের কোনোক্রমেই নিস্তার থাকৃত না। কিন্তু তা ত নয়, প্রকাশেই যে তাঁর আনন্দ। নইলে এই জগৎ তিনি প্রকাশ করলেন কেন? বাইরে থেকে কোনো প্রকাণ্ড পীড়া জোর করে তাঁকে প্রকাশ করিয়েছে? মায়া নামক কোনো একটা পদার্থ ব্রহ্মকে একেবারে অভিভূত করে নিজেকে প্রকাশমান করেছে?

সে ত হতেই পারে না। তাই উপনিষৎ বলেছেন—আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি—এই যে প্রকাশমান জগৎ এ আর কিছু নয়, তাঁর

মৃত্যুহীন আনন্দই রূপধারণ করে প্রকাশ পাচ্ছে। আনন্দই তাঁর প্রকাশ, প্রকাশেই তাঁর আনন্দ।

তিনি যদি প্রকাশেই আনন্দিত তবে আমি কি আনন্দের জন্যে অপ্রকাশের সন্ধান করব? তাঁর যদি ইচ্ছাই হয় প্রকাশ তবে আমার এই ক্ষুদ্র ইচ্ছাটুকুর দ্বারা আমি তাঁর সেই প্রকাশের হাত এড়াই বা কেমন করে?

তাঁর আনন্দের সঙ্গে যোগ না দিয়ে আমি কিছুতেই আনন্দিত হতে পারব না। এর সঙ্গে যেখানেই আমার যোগ সম্পূর্ণ হবে সেইখানেই আমার মুক্তি হবে সেইখানেই আমার আনন্দ হবে। বিশ্বের মধ্যে তাঁর প্রকাশকে অবাধে উপলব্ধি করেই আমি মুক্ত হব—নিজের মধ্যে তাঁর প্রকাশকে অবাধে দীপ্যমান করেই আমি মুক্ত হব। ভববন্ধন অর্থাৎ হওয়ার বন্ধন ছেদন করে মুক্তি নয়—হওয়াকেই বন্ধনস্বরূপ না করে মুক্তিস্বরূপ

করাই হচ্চে মুক্তি। কর্ম্মকে পরিত্যাগ করাই মুক্তি নয়, কর্ম্মকে আনন্দোদ্ভব কর্ম্ম করাই মুক্তি। তিনি যেমন আনন্দ প্রকাশ করচেন তেমনি আনন্দেই প্রকাশকে বরণ করা, তিনি যেমন আনন্দে কর্ম্ম করচেন তেমনি আনন্দেই কর্ম্মকে গ্রহণ করা এ'কেই বলি মুক্তি। কিছুই বর্জ্জন না করে সমস্তকেই সত্যভাবে স্বীকার করে মুক্তি।

প্রতিদিনের এই যে অভ্যস্ত পৃথিবী আমার কাছে জীর্ণ, অভ্যস্ত প্রভাত আমার কাছে ম্লান, কবে এরাই আমার কাছে নবীন ও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে? যেদিন প্রেমের দ্বারা আমার চেতনা নবশক্তিতে জাগ্রত হয়। যাকে ভালবাসি আজ তার সঙ্গে দেখা হবে এই কথা স্মরণ হলে কাল যা কিছু শ্রীহীন ছিল আজ সেই সমস্তই সুন্দর হয়ে ওঠে। প্রেমের দ্বারা চেতনা যে পূর্ণশক্তি লাভ করে সেই পূর্ণতার দ্বারাই সে সীমার মধ্যে অসীমকে

রূপের মধ্যে অপরূপকে দেখ্‌তে পায় তাকে নূতন কোথাও যেতে হয় না। ঐ অভাবটুকুর দ্বারাই অসীম সত্য তার কাছে সীমায় বদ্ধ হয়ে ছিল।

বিশ্ব তাঁর আনন্দরূপ—কিন্তু আমরা রূপকে দেখ্‌চি আনন্দকে দেখ্‌চিনে—সেই জন্যে রূপ কেবল পদে পদে আমাদের আঘাত করচে—আনন্দকে যেমনি দেখ্‌ব অমনি কেউ আর আমাদের কোনো বাধা দিতে পারবেনা। সেই ত মুক্তি।

সেই মুক্তি বৈরাগ্যের মুক্তি নয়—সেই মুক্তি প্রেমের মুক্তি। ত্যাগের মুক্তি নয় যোগের মুক্তি। লয়ের মুক্তি নয় প্রকাশের মুক্তি।

৭ই বৈশাখ

মুক্তির পথ

যে ভাষা জানিনে সেই ভাষার কাব্য যদি শোনা যায় তবে শব্দগুলো কেবলি আমার কানে ঠেকতে থাকে—সেই ভাষা আমাকে পীড়া দেয়।

ভাষার সঙ্গে যখন পরিচয় হয় তখন শব্দ আর আমার বাধা হয় না। তখন তার ভিতরকার ভাবটি গ্রহণ করবামাত্র শব্দই আনন্দকর হয়ে ওঠে—তখন তাকে কাব্য বলে বুঝ্‌তে পারি ভোগ করতে পারি।

বালক যখন কোনো দুর্ব্বোধ ভাষার কাব্য শোনার পীড়া হতে মুক্তি প্রার্থনা করে তখন কাব্য পাঠ বন্ধ করে তাকে যে মুক্তি দেওয়া যায় সে মুক্তির মূল্য অতি তুচ্ছ। কিন্তু সেই পাঠটিকে তার পক্ষে সত্য করে তুলে পূর্ণ করে

তুলে তাকে যে মূঢ়তার পীড়া হতে মুক্তি দেওয়া হয় সেই হচ্চে যথার্থ মুক্তি, চিরন্তন মুক্তি।

পৃথিবীতে তেমনি হওয়াতেই যদি আমরা দুঃখ পাই, তাকে আমরা ভবযন্ত্রণা বলি, জগৎ যদি আমাদের আনন্দ না দেয়—তবে বিশ্ব-কবির এই বিরাট কাব্যকে অর্থহীন অমূলক পদার্থ বলে এর থেকে নিষ্কৃতি পাওয়াকেই আমরা চরিতার্থতা বল্‌ব।

কিন্তু এই কাব্যখানিকে আমরা নিজের ইচ্ছামত ছিঁড়ে পুড়িয়ে একেবারে এর চিহ্ন লোপ করে দিতে পারি এমন কথা মনে করবার কোনো হেতু নেই।

সমুদ্রকে বিলুপ্ত করে দিয়ে সমুদ্র পার হবার চেষ্টা করার চেয়ে সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে পার হওয়া ঢের বেশি সহজ। এ পর্য্যন্ত কোনো দেশের মানুষ সমুদ্র সেঁচে ফেলবার চেষ্টা করেনি—তারা সাধ্যমত নৌকো জাহাজ বানিয়েছে।

বিশ্বকাব্যকে নিরর্থক অপবাদ দিয়ে পুড়িয়ে নষ্ট করবার তপস্যায় প্রবৃত্ত না হয়ে বিশ্বকাব্য শোনাকে সার্থক করে তোলাই হচ্ছে যথার্থ মুক্তি।

এই বিশ্ব প্রকাশের রূপের মধ্যে যখন আনন্দকে দেখ্‌ব কেবলই রূপকে দেখব্‌না তখন রূপ আমাকে আর বাধা দেবেনা—সে যে কেবল পথ ছেড়ে দেবে তা নয় আনন্দই দেবে। ভাবটি বোঝবামাত্র ভাষা যে কেবল তার পীড়াকরতা ত্যাগ করে তা নয় ভাষা তখন নিজের সৌন্দর্য্য উদ্‌ঘাটন করে আনন্দময় হয়ে ওঠে—ভাবে ভাষায় অন্তরে বাহিরে মিলন তখন আমাদের মুগ্ধ করে। তখন সেই ভাষার উপরে যদি কেউ কিছুমাত্র হস্তক্ষেপ করে সে আমাদের পক্ষে অসহ্য হয়ে ওঠে।

কিন্তু এই যে ভিতরকার আনন্দ এটা বাইরে থেকে বোঝা যায় না—এটা নিজের

ভিতর থেকেই বুঝতে হয়। যে ভাষা জানিনে কেবল মাত্র বাইরে থেকে বইয়ের উপর চোখ বুলিয়ে বুলিয়ে কোনো কালেই তাকে পাওয়া যায় না। চোখ কান সেখান থেকে প্রতিহতই হতে থাকে। নিজের ভিতরকার জ্ঞানের শক্তিতেই তাকে বুঝতে হয়। যখন একবার ভিতর বুঝি তখন বাইরে আর কোনো বাধা থাকে না। তখন বাইরেও আনন্দ প্রকাশিত হয়।

আমার মধ্যে যখন আনন্দের আবির্ভাব হয় তখন বাইরের আনন্দরূপ আপনি আমার কাছে অমৃতে পূর্ণ হয়ে দেখা দেয়। পাওয়াই পাওয়াকে টেনে নিয়ে আসে। মরুভূমির রসহীন তপ্ত বাতাসের ঊর্দ্ধ দিয়ে কত মেঘ চলে যায়—শুষ্ক হাওয়া তার কাছ থেকে বৃষ্টি আদায় করে নিতে পারে না। যেখানে হাওয়ার মধ্যেই জল আছে সেখানে সজল মেঘের সঙ্গে তার যোগ হয়ে বর্ষণ উপস্থিত হয়।

আমার মধ্যে যদি আনন্দ না থাকে তবে বিশ্বের চিরানন্দ প্রবাহ আমার উপর দিয়ে নিরর্থক হয়েই চলে যায়—আমি তার কাছ থেকে রস আদায় করতে পারিনে।

আমার মধ্যে জ্ঞানের উন্মেষ হলে তখন সেই জ্ঞানদৃষ্টিতেই জানতে পারি বিশ্বের কোথাও জ্ঞানের ব্যত্যয় নেই—তাকেই আমরা বিজ্ঞান বলি। যে মূঢ়, যার জ্ঞানদৃষ্টি খোলে নি সে বিশ্বেও সর্ব্বত্র মূঢ়তা দেখে, বিশ্ব তার কাছে ভূতপ্রেত দৈত্যদানায় বিভীষিকাপূর্ণ হয়ে ওঠে।

এমনি সকল বিষয়েই। আমার মধ্যে যদি প্রেম না জাগে আনন্দ না থাকে তবে বিশ্ব আমার পক্ষে কারাগার। সেই কারাগার থেকে পালাবার চেষ্টা মিথ্যা—প্রেমকে জাগিয়ে তোলাই মুক্তি। কোনো ব্যায়ামের দ্বারা কোনো কৌশলের দ্বারা মুক্তি নেই।

বিজ্ঞানের সাধনা যেমন আমাদের প্রাকৃ-

তিক জ্ঞানের বন্ধন মোচন করচে তেমনি মঙ্গলের সাধনাই আমাদের প্রেমের, আমাদের আনন্দের বন্ধন মোচন করে দেয়। এই মঙ্গল সাধনাই আমাদের সঙ্কীর্ণ প্রেমকে প্রশস্ত, খামখেয়ালি প্রেমকে জ্ঞানসম্মত করে তোলে।

বিজ্ঞানে প্রকৃতির মধ্যে আমাদের জ্ঞান যোগযুক্ত হয়—সে বিচ্ছিন্ন জ্ঞান নয়—সে অতীতে বর্ত্তমানে ভবিষ্যতে দূরে ও নিকটে সর্ব্বত্র ঐক্যের দ্বারা অনন্তের সঙ্গে যুক্ত। মঙ্গলেও তেমনি প্রেম সর্ব্বত্র যোগযুক্ত হয়। সমস্ত সাময়িকতা ও স্থানিকতাকে অতিক্রম করে সে অনন্তে মিলিত হয়। তার কাছে দূর নিকটের ভেদ ঘোচে, পরিচিত অপরিচিতের ভেদ ঘুচে যায়। তখনি প্রেমের বন্ধন মোচন হয়ে যায়। এ'কেই ত বলে মুক্তি।

বুদ্ধদেব শূন্যকে মান্‌তেন কি পূর্ণকে মান্‌তেন সে তর্কের মধ্যে যেতে চাইনে।

কিন্তু তিনি মঙ্গল সাধনার দ্বারা প্রেমকে বিশ্বচরাচরে মুক্ত করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। তাঁর মুক্তির সাধনাই ছিল, স্বার্থত্যাগ, অহঙ্কারত্যাগ, ক্রোধত্যাগের সাধনা—ক্ষমার সাধনা, দয়ার সাধনা, প্রেমের সাধনা। এমনি করে প্রেম যখন অহংএর শাসন অতিক্রম করে বিশ্বের মধ্যে অনন্তের মধ্যে মুক্ত হয় তখন সে যা পায় তাকে যে নামই দাওনা কেন সে কেবল ভাষার বৈচিত্র্য মাত্র, কিন্তু সেইই মুক্তি। এই প্রেম যা যেখানে আছে কিছুকেই ত্যাগ করে না, সমস্তকেই সত্যময় করে পূর্ণতম করে উপলব্ধি করে—নিজেকে পূর্ণের মধ্যে সমর্পণ করবার কোনো বাধাই মানে না।

আত্মার মধ্যে পরমাত্মার অনন্ত প্রেম অনন্ত আনন্দকে অবাধে উপলব্ধি করবার উপায় হচ্চে,—পাপপরিশূন্য মঙ্গল সাধন। সেই উপলব্ধি যতই বন্ধনহীন যতই সত্য হতে

থাকবে ততই বিশ্বসংসারে সমস্ত ইন্দ্রিয়বোধে চিন্তায় ভাবে কর্ম্মে আমাদের আনন্দ অব্যাহত হবে। আমরা তখন পরমাত্মার দিক থেকেই জগৎকে দেখব—নিজের দিক থেকে নয়। তখনই জগতের সত্য আমাদের কাছে আনন্দে পরিপূর্ণ হবে—মহাকবির চিরন্তন কাব্য আমাদের কাছে সার্থক হয়ে উঠ্‌বে।

৭ই বৈশাখ